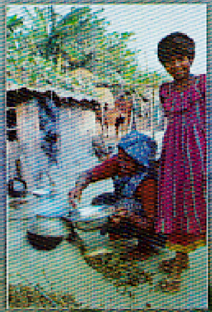

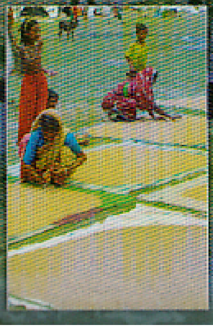

কুন্দেরপাড়া: নিসর্গ ও অন্তর ● মোহাম্মদ মাহমুদুর রশিদ

দুর্যোগ প্রশমন ও স্বাবলম্বিতা সৃষ্টির আদর্শ গ্রাম

কুন্দেরপাড়া

নিসর্গ ও অন্তর

মোহাম্মদ মাহমুদুর রশিদ

গণ উন্নয়ন কেন্দ্র
Gana Unnayan Kendra

Oxfam GB

দুর্যোগ প্রশমন ও স্বাবলম্বিতা সৃষ্টির আদর্শ গ্রাম

কুন্দেরপাড়া

নিসর্গ ও অন্তর

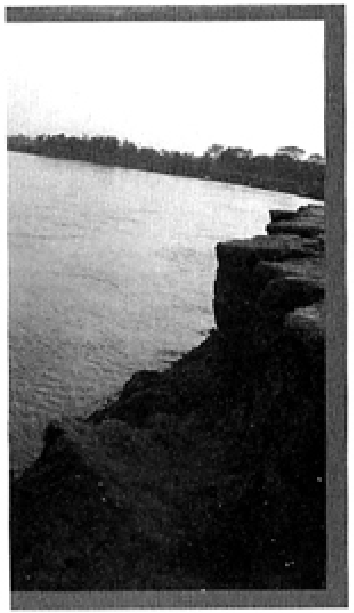

গবেষণা, প্রণয়ন ও সম্পাদনা

মোহাম্মদ মাহমুদুর রশিদ

প্রকাশনায়

গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (জিইউকে)

আর্থিক সহায়তায় : অক্সফাম-জিবি

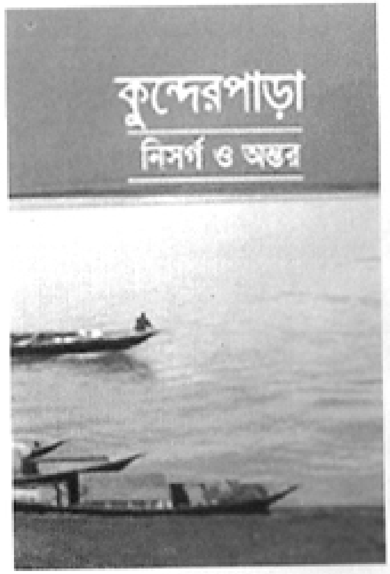

প্রথম গ্রন্থ সংস্করণ

ফেব্রুয়ারি ২০১২; ফাল্গুন ১৪১৮

অক্সফাম-জিবির আর্থিক সহায়তায় এবং গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (জিইউকে)-এর 'ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন (ডিআরআর)' প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত সমীক্ষার প্রকাশিত রূপ।

গবেষণা পরিচালনা প্রতিষ্ঠান

সহযোগী

প্রকাশনা রূপকার

সহযোগী মিডিয়া

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : নাজিব তারেক

আলোকচিত্র: কুদ্দুস আলম ও আফতাব আহমেদ

মূল্য : ১৬০.০০ টাকা মাত্র

Price for abroad : $ 2.00 only

তথ্য গ্রহণকাল

নভেম্বর ২০০৯ থেকে মার্চ-২০১০

প্রকাশনায়

গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (জিইউকে)

© এ প্রকাশনার যে কোন অংশ লিখিত অনুমোদন ব্যতিরেকে পুর্নমুদ্রণ করা যাবে না। তবে যে কেউ এর অংশবিশেষ গবেষণা বা লেখায় কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ সাপেক্ষে উদ্ধৃত করতে পারেন।

Kunderpara: Nisorgo o Antar

(Kunderpara: Landscape & Inherent)

publication is formatted enlight of the study of a model village on disaster mitigation and self-relients, under *'Disaster Risk Reduction (DRR)'* project of GUK, financial support by Oxfam-GB.

Research, Formation & Edition

Moh. Mahmudur Rashid of SOHOYOGEE

Published by: Gana Unnayan Kendra (GUK), Post box.-14, Nashratpur, Gaibandha, Bangladesh.

Phone: 880-2-0541-89042, 01713-484696

E-mail : guk.gaibandha@gmail.com

Web portal : www.guk.org.bd

সূচীপত্র

বিষয় — পৃষ্ঠা নং

মুখবন্ধ — সাত - আট

প্রারম্ভিকা — নয় – দশ

ভূমিকা

এক: পরিধি, প্রতীতি ও প্রাতিস্বিকতা — এগার –পনের

নিসর্গ ও অন্তর – ১১, বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রতিকার ভাবনা –১২
বন্যা ও নদীভাঙন-কবলিত জনপদের উন্নয়ন প্রেক্ষাপট –১৩

দুই: গবেষণার মৌলিক বিষয়াদি — ষোল –বিশ

গবেষণা নকশা– ১৬, উদ্দেশ্য ও প্রত্যয়– ১৮, মেয়াদকাল– ১৯
ব্যবহৃত পদ্ধতি–১৯, সীমাবদ্ধতা ও উত্তরণ– ২০

অধ্যায়-১: কুন্দেরপাড়ার প্রাগৈতিহাস — ২১-২৩

অগস্ত্যমান ইতিহাস-২১, কুন্দেরপাড়ার পুর্নজন্ম কোষ্ঠী-২২

অধ্যায়-২: আশা-নিরাশার জনপদ — ২৪-২৭

কুন্দেরপাড়া পরিচিতি–২৪, চরের জনজীবন:দুর্যোগের সাথে বসবাস –২৫
বাঁচার উপায়ের খোঁজে –২৬

অধ্যায়-৩: গণ উন্নয়ন কেন্দ্র : বিপন্ন মানুষের পাশে — ২৮-৩২

গ্রামবাসীর আগের অবস্থার চিত্র –২৮, উন্নয়ন ও পরিবর্তনের লক্ষ্যে জিইউকে–৩১

অধ্যায়-৪: দুঃখ মোচন — ৩৩-৪০

বন্যা ও নদীভাঙন : কুন্দেরপাড়ার প্রধান দুঃখ-৩৩
বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র: স্বপ্ন আর চালিকাশক্তি-৩৬
দুর্যোগ ঝুঁকি ও ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস: কুন্দেরপাড়ার প্রধান অগ্রাধিকার -৩৮

অধ্যায়-৫: হাসি ফোটানো — ৪১-৫১

সমিতি বা দল গঠন-৪১, কুন্দেরপাড়ার শিক্ষার আলো -৪২, চরের কৃষিতে যোগ হয়েছে নতুন মাত্রা-৪৪, জীবন-মান উন্নয়নে ফিরেছে আত্মবিশ্বাস-৪৬, অধিকার, জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন-৪৭, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ উন্নয়ন-৪৯, সাংগঠনিক সক্ষমতা উন্নয়ন-৫১

অধ্যায়-৬: কুন্দেরপাড়া: কালজ থেকে কালোত্তর — ৫২-৫৫

আজকের কুন্দেরপাড়া–৫২, কুন্দেরপাড়ার স্বকীয়তা-৫৪

অধ্যায়-৭ : অনুধাবন ও করণীয় — ৫৬-৬১

কিছু প্রতিবন্ধকতা–৫৬, উত্তোরণ ভাবনা-৫৮
স্থায়িত্বশীলতার প্রশ্নে কিছুক্ষণ -৫৯, কুন্দেরপাড়ার ভবিষ্যত- ৬১

উপসংহার — ৬২-৬৩

এক নজরে কুন্দেরপাড়া — ৬৪

কুন্দেরপাড়ার স্থির চিত্র — ৬৫-৭২

পরিশিষ্ট — ৭৩

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের স্থানীয়ভিত্তিক ধারাবাহিক উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন প্রচেষ্টায় গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (জিইউকে)-এর গৃহীত দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, জীবনমান উন্নয়ন এবং অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন কর্মসূচিতে অক্সফাম-এর সংশ্লিষ্টতা দু'দশকের। বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা অক্সফাম ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকালিন অসহায় আর্ত-মানবতার সেবা, প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি প্রশমন এবং মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশের পুর্নগঠনসহ বহুবিধ উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও সহায়তাদান করে আসছে। এসবের ব্যত্যয় ঘটেনি দেশের অন্যতম বন্যাজনিত দুর্যোগপ্রবণ এলাকা গাইবান্ধার ক্ষেত্রেও। ১৯৯১ সাল থেকে জিইউকে'র সংশ্লিষ্ট কর্মসূচিতে অক্সফাম-এর সহযোগিতা অব্যাহত থাকে। ১৯৯৫ সালের ভয়াবহ বন্যায় বিপর্যস্ত চরাঞ্চলের দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর করুণ অবস্থা খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করে জিইউকে'র সাথে অক্সফাম-জিবি'র প্রতিনিধিরা। এই উপলব্ধি থেকে মূলত ১৯৯৭ সালে গৃহীত 'সমন্বিত দুর্যোগ প্রস্তুতি ও চর উন্নয়ন কর্মসূচি'তে অনুপ্রেরণা, আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা প্রদান করে অক্সফাম-জিবি।

কুন্দেরপাড়া গাইবান্ধা সদর উপজেলার কামারজানি ইউনিয়নের একটি গ্রাম –যা দুই যুগেরও অধিককাল নদীগর্ভে বিলীন থাকার পর ১৯৮৭-৮৮ সালের মধ্যে পুর্নজন্ম নেয়। নদী ভাঙনের শিকার ভূমিহীন উদ্বাস্তুদের জন্য জেগে উঠা চর অনেকটা নতুন করে বাঁচার স্বপ্নের মতো হলেও বিভিন্ন প্রতিকূলতায় তা অনেকক্ষেত্রেই সম্ভব হয়ে উঠে না। এসব প্রতিকূলতার বিপরীতে চরাঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধি ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সুসংগঠিত ও ধারাবাহিক উন্নয়ন প্রচেষ্টা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কুন্দেরপাড়াসহ অনেক চরাঞ্চলের জনগণের উন্নয়নে এই অপরিহার্যতাকেই অব্যাহত রাখতে বদ্ধপরিকর জিইউকে।

জিইউকের বিভিন্ন কর্মসূচির আওতায় কুন্দেরপাড়ায় ১৯৯৫-৯৬ সাল থেকে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। প্রায় পনের বছর পরে আজকের গ্রামটির পরিবর্তিত চেহারা দেখে হয়তো অনুমান করা কঠিন হবে -এর পেছনে কতটা শ্রম, ত্যাগ আর তিতিক্ষা যোগাতে হয়েছে। সেই দিনগুলোর কথা ভাবলে স্বভাবতই স্মৃতিকাতর হতে হয়। বন্যার সময়ে চরে দিনের পর দিন অভুক্ত, অর্ধভুক্ত শিশু আর নারী-পুরুষের আর্ত-দৃষ্টি সহসাই ভুলিয়ে দিত অবিরাম বৃষ্টি, উত্তাল ঢেও আর প্রবল স্রোতের নদীপথের দুর্গমতাকে। ওদের পাশে দাঁড়াতে, একটু আশ্বাস দেবার জন্য ছুটে যেতে জিইউকের সেই সময়ের ব্রতজীবী কর্মীরা দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখে। তাদের ত্যাগী মানসিকতার কারণে কুন্দেরপাড়াসহ অনেকগুলো চর আজ সক্ষম ও স্বাবলম্বী জনপদে পরিণত হয়েছে –এই উপলক্ষে তাদের প্রতিও গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

জিইউকে'র যে সকল উন্নয়ন সহযোগী সারথীর উৎসাহ ও সহযোগিতায় আমরা তখন উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত হয়েছি তাঁদের প্রতি আমি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই। এদের অনেকেই আমাদেরকে দক্ষতা ও নির্দেশনা দিয়ে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। বিশেষ করে দু'জনের নাম উল্লেখ না করলে এই প্রকাশনার পরিপূর্ণতা আসবে না –যাঁর একজন হচ্ছেন বাংলাদেশের দুর্যোগ-ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন সফল উন্নয়ন উদ্যোগ-এর অন্যতম রূপকার এবং বর্তমানে ডিজাস্টার

ফোরাম-এর আহবায়ক জনাব গওহর নঈম ওয়ারা এবং অপরজন হচ্ছেন অক্সফাম-জিবি'র তৎকালিন কর্মকর্তা এনামুল হক (বর্তমানে ইসলামিক রিলিফ-এর আর্ন্তজাতিক কর্মকর্তা)। বস্তুত, দুর্যোগ-ব্যবস্থাপনা ও দারিদ্র্য বিমোচনের বহুবিধ কর্মযজ্ঞে জিইউকের সাফল্য ও সক্ষমতার পেছনে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পরামর্শ, সহযোগিতা ও আন্তরিকতা, প্রত্যক্ষ শ্রম এবং সম-উপলব্ধির জন্য এ দু'জন সর্বদাই শ্রদ্ধাভাজন হয়ে থাকবেন। এরা ছিলেন জিইউকে'র বিভিন্ন উন্নয়ন উদ্যোগের পৃষ্ঠপোষক এবং অবদান রেখেছেন কুন্দেরপাড়ার পরিবর্তনেও।

একটি ধূসর নদীচরের (কুন্দেরপাড়া) ক্রমান্বয়ে সম্ভাবনাময়ী জনপদ হিসেবে পরিণত হবার প্রেক্ষাপটগুলোকে পদ্ধতিগতভাবে বিশ্লেষণ করাটা এখন আধুনিকতার দাবী। কারণ আমরা মনে করছি, এর মাধ্যমে আমরা আমাদের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির সমীকরণকে যেমন প্রত্যক্ষ করতে পারবো, তেমনি এই অভিজ্ঞতা ও শিক্ষণকে বিভিন্ন উদ্যোগী ও অনুরাগীদের মাঝে সঞ্চালিত করতে পারবো। এ কারণেই উক্ত সমীক্ষা ও প্রকাশনার উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে।

কুন্দেরপাড়া: নিসর্গ ও অন্তর এই প্রয়াসেরই প্রণালীবদ্ধ প্রতিরূপ। পেশাদারিত্ব ও মনোযোগের সাথে এই সমীক্ষার দায়িত্ব পালন করায় সামাজিক-উন্নয়ন ও গবেষণার ক্ষেত্রে কর্মরত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান 'সহযোগী'র নির্বাহী প্রধান মাহমুদুর রশিদ-কে জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। বিশেষ করে, প্রথাগত গবেষণার কাঠামোকে সুপাঠ্য প্রকাশনায় নিয়ে আসতে তিনি অনেক বাড়তি পরিশ্রম করেছেন।

সেইসাথে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি কুন্দেরপাড়ার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, বিভিন্ন উন্নয়ন সমিতির সদস্য, বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী ও গ্রামবাসীদেরকে যারা দৈনন্দিন কাজের মাঝেও এ সমীক্ষার জন্য তথ্য প্রদান করে বিভিন্ন সময়ে সহযোগিতা করেছেন।

এই প্রকাশনার জন্য জিইউকের পক্ষ থেকে বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্ত প্রদান এবং শেয়ারিং সেশনে জটিল বিষয়গুলোর উপর সুচিন্তিত মতামত দিয়ে যারা সহায়তা করেছেন তাদের মধ্যে বিশেষ করে আঞ্জুম নাহিদ চৌধুরী (পরিচালক), মোঃ মহিরুল ইসলাম তুষার (সমন্বয়কারী-ফিল্ড অপারেশন), আসাদুল ইসলাম (কর্মসূচি ব্যবস্থাপক -মনিটরিং ও ইভালুয়েশন), আফতাব হোসেন (কর্মসূচি ব্যবস্থাপক- তথ্য ও জনসংযোগ), ধরিত্রীন্দু বর্মন (ডকুমেন্টেশন কর্মকর্তা)সহ অনেককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। প্রকাশনার জন্য সহযোগী মিডিয়া'র মুদ্রণ কারিগরী প্রচেষ্টা এর সাথে যুক্ত হয়েছে। শিল্পী নাজিব তারেক বইটির প্রচ্ছদ এঁকে কৃতার্থ করেছেন। জিইউকের নিজস্ব সংগ্রহ ছাড়াও দৃক সদস্য কুদ্দুস আলম বিভিন্ন ছবি সংগ্রহ করেছেন। এদের সকলের প্রতি জানাই অশেষ ধন্যবাদ।

সবশেষে বইটির পাঠকমহলের কাছে নিবেদন, এই প্রকাশনার উপর যে কোন মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ আমরা সাগ্রহ চিত্তে প্রত্যাশা করছি- যা আমাদের পরবর্তী সংস্করণ ও প্রকাশনাগুলোকে সমৃদ্ধ করবে।

এম. আবদুস্ সালাম
নির্বাহী প্রধান, গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (জিইউকে)

প্রারম্ভিকা

কুন্দেরপাড়া: নিসর্গ ও অন্তর -এ *নিসর্গের* (landscape) মধ্য দিয়ে যে কুন্দেরপাড়ার চিত্র দেখা যায় ওঠে তা শুধুমাত্র ব্রহ্মপুত্র-যমুনার গর্ভে পুর্নজন্ম নেয়া নদীর চরের প্রাকৃতিক অবয়ব নয়; বরং এর সাথে রয়েছে সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশ, প্রযুক্তি ও ভৌত অবকাঠামোর মিশ্রণ –যা ক্রমাগত বিবর্তনের মাধ্যমে স্থায়িত্বশীলতার ভিত্তি ও সম্ভাবনাময় রূপ লাভ করেছে। অন্তর (inherent) এর মাধ্যমে সংবেদিত হয় এর অন্তর্গত রূপ, জনপদের দৈনন্দিন ও স্বাভাবিক সংস্কৃতির প্রতিচ্ছায়া, মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না আর আশা-নিরাশা, তাদের সক্ষমতা, শক্তি, সংহতি, দায়িত্বশীলতা, পরিবর্তনের স্তর, সভ্যতা ও উন্নয়ন। উভয়ক্ষেত্রেই খুব সীমিত পরিসরে ও পরোক্ষভাবে বিশ্লিষ্ট হয়েছে বিষয়-সংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট –যার প্রয়োজন শুধুমাত্র ঘটনার পারিপার্শ্বিকতাকে অধিকতর স্পষ্ট করার জন্য।

নিসর্গ ও অন্তর মলাটের মাঝে অধ্যায়-এক থেকে সাত পর্যন্ত সংকলিত হয়েছে সমীক্ষার জন্য সংগৃহীত তথ্যগুলোর আলোকে বিশ্লেষণসহ কিছু মতামত। প্রথম অধ্যায়কে কুন্দেরপাড়ার *প্রাগৈতিহাস* হিসেবে অভিহিত করার কারণ এই অনুসন্ধান পর্বটি বিভিন্নসময়ে কুন্দেরপাড়ার চরের সৃষ্টির বৃত্তান্ত –যার ইতিহাস স্পষ্ট নয়। এতদঞ্চলের নদীর ভৌগলিক ইতিহাস তথা ব্রহ্মপুত্রের ধারার গতিপ্রবাহ পরিবর্তনের ফলে একটি নদীময় জনপদ কিভাবে অশান্ত ও বিপদাপন্ন হয় এবং ক্রমাগত চরের সৃষ্টি বা বিলুপ্তি করে –তার প্রেষণা থেকেই এই অংশের সন্নিবেশ। এখানে ঘটনার অসম্পূর্ণ ইতিবৃত্তের সাথে রূপকল্পের সংমিশ্রণ ঘটানোর উদ্দেশ্য পাঠকের সংবেদনশীলতার অন্বেষণ করা, যেন তিনি নিজেই সেই প্রাগৈতিহাসের একটা চিত্র নিজের মাঝে আঁকতে পারেন এবং এর মাধ্যমেই তিনি প্রবেশ করতে পারেন সমীক্ষার অন্তকরণে। পরের সন্নিবেশন *কুন্দেরপাড়ার পুর্নজন্মকোষ্ঠীতে* বর্তমান কুন্দেরপাড়ার জন্ম ও মাটির লগ্নতা প্রত্যাশী ভাঙ্গন কবলিতদের মাধ্যমে আবার ধীরে ধীরে একটি জনপদ গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে –যাদের ঠিকানা একসময়ে নদীগর্ভে বিলীন হয়েছিল। নতুন ইতিহাসের শুরু এখান থেকেই।

আশা-নিরাশার জনপদ অংশের শুরুতে পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য প্রথমেই কুন্দেরপাড়ার বর্তমান অবস্থান ও অবস্থা সম্পর্কে একটা সাধারণ পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপন্ন কুন্দেরপাড়ার বিগত অবস্থা এবং এই অবস্থা পরবর্তনে জনগণের প্রত্যাশা এখানে বিশ্লেষিত হয়েছে।

এ পর্যন্ত সন্নিবেশিত তথ্যাবলীকে বিবেচনা করা হয়েছে প্রাক-ঘটনা (background) হিসেবে। *গণ উন্নয়ন কেন্দ্র : বিপন্ন মানুষের পাশে* অংশে মূলত বিভিন্ন প্রেক্ষাপট থেকে কুন্দেরপাড়ার অবস্থান বিশ্লেষণ করা হয়েছে যার কারণে সেখানে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (জিইউকে) নামক বেসরকারি সংগঠনের সম্পৃক্ততার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করা সম্ভব হয়। কুন্দেরপাড়ায় উন্নয়নমূলক কাজে জিইউকের সম্পৃক্ত হবার আগের ও পরের চিত্রগুলোর

প্রতিফলন এসেছে মূলত চরবাসীর দেয়া বিভিন্ন তথ্য অনুযায়ী। তাদের ভাষ্যই তথ্যসমূহে উপস্থাপন করা হয়েছে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের সাহায্য নিয়ে।

দুঃখ মোচন ও *হাসি ফোটানো* অধ্যায় দুটোই সমাধান কেন্দ্রিক। এর মধ্যে 'দুঃখ মোচন' অংশে শুধু প্রাকৃতিক-দুর্যোগ ঝুঁকি-হ্রাস বিষয়ক কার্যক্রম এবং 'হাসি ফোটানো' অংশে জীবন-মান উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, নারীর ক্ষমতায়ন, সাংগঠনিক সক্ষমতাসহ অন্যান্য কার্যক্রমের প্রভাব বিশ্লিষ্ট হয়েছে। এখানে সমস্যা চিহ্নিতকরণ, অগ্রাধিকারকরণ এবং প্রচেষ্টাগ্রহণ (intervention) গুলোও বিশ্লেষিত হয়েছে।

কুন্দেরপাড়ার পরিবর্তনটি তাদের চোখেই বেশী স্পষ্ট যারা এর পূর্বের রূপ দেখেছিল। সেজন্য প্রয়োজনীয় এফজিডি ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তুলে আনা হয়েছে পরিবর্তনগুলো এবং এসব পরিবর্তনের গতি-প্রকৃতি ও রূপভেদ। *কুন্দেরপাড়াঃ কালোজ থেকে কালোত্তর* অংশে এসব পরিবর্তনকে বাইরে থেকে (externally) এবং অন্তর্নিহিতভাবে (internally) দেখার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। সবমিলিয়ে চেষ্টা করা হয়েছে বিগত পনের বছরে সম্পাদিত বিভিন্ন কর্মসূচির প্রভাব (impact) নিরূপনের। পরিবর্তিত অবস্থার তাত্ত্বিক পর্যালোচনাও আনা হয়েছে সংক্ষিপ্তভাবে। কুন্দেরপাড়ার স্থিত অবস্থার লব্ধ-জ্ঞান এর উপর ভিত্তি করে অনুধাবন ও করণীয় অংশে রয়েছে প্রতিবন্ধকতা, উত্তোরণ, স্থায়িত্বশীলতা এবং করণীয় বিষয়ক ভাবনাগুলো।

কুন্দেরপাড়ার উপর সংগৃহীত কিছু আলোকচিত্র রাখা হয়েছে এই প্রকাশনায় –যা সমীক্ষার জন্য প্রযোজ্য। ভূমিকা অংশের দ্বিতীয় পর্বে সংকলিত হয়েছে *গবেষণার মৌলিক বিষয়াদি*, যেখানে স্থান পেয়েছে গবেষণার যৌক্তিকতা (justification), উদ্দেশ্য, প্রত্যয় (concept) ও পদ্ধতিসহ বিভিন্ন কারিগরী দিক। পরিশিষ্টতেও সংযোজিত হয়েছে প্রয়োজনীয় তথ্য।

গবেষণার ভাবমূর্তির প্রয়োজনে হলেও এর উপস্থাপনা অনেকক্ষেত্রেই কারিগরী ও পরিভাষাপূর্ণ খটমটে ও রসহীনতায় পরিণত হয়ে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটায়। ফলে যে কোন গবেষণা বা সমীক্ষার পাঠক হয়ে থাকেন অত্যন্ত সীমিত। এই সীমাবদ্ধতা থেকে উত্তোরণের লক্ষ্যেই এই প্রকাশনার পাঠকদের হৃদয়ঙ্গমের সুবিধার্থে প্রমিত গদ্যরস থেকে বঞ্চিত না করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। সেজন্য এর উপস্থাপনা ও ভাষা বৈশিষ্ট্যে সাবলিলতা আনার চেষ্টা করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই কিছু কম প্রচলিত অথচ যুৎসই শব্দকে নির্বাচিত করা হয়েছে কিন্তু তা যেন পাঠক সহজে বুঝতে পারে সেজন্য পরিভাষা অংশে শব্দের পরিচিতি দেয়া হয়েছে। ক্ষেত্র বিশেষে রূপকল্প ব্যবহার করা হলেও প্রকৃতপক্ষে তা অবাস্তব কিছু নয়, বরং এসব রূপকল্প গবেষকের অনেকগুলো পর্যবেক্ষণ ও প্রতীতির গড় চিত্র– যা'র প্রকাশে রূপককেই ব্যবহার করা হয়েছে সংক্ষিপ্ত ও সহজ মাধ্যম হিসেবে।

সবশেষে প্রত্যাশা, গ্রন্থ আকারে প্রকাশের প্রচেষ্টাগুলো পাঠকমহলের জন্য সহায়ক হলেই এই প্রকাশনা সার্থক হবে।

মোহাম্মদ মাহমুদুর রশিদ

ভূমিকা

এক : পরিধি, প্রতীতি ও প্রাতিস্বিকতা

নিসর্গ ও অন্তর

এটা সত্য যে, আশাহীনে আশা জাগানো তথা আত্ম-নির্ভরতায় উজ্জীবিত করাটা অনেক বড় ধরনের সাফল্য, যা সচরাচর দেখা মেলে না আর যা ততটা সহজ কাজও নয়। একজন ক্ষমতাহীন ব্যক্তিকে ক্ষমতায়িত করার আগে তার মাঝে পরিবর্তনের সদিচ্ছা জাগিয়ে তোলা একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

দুর্যোগপীড়িত জনগোষ্ঠীর ম্লান মূঢ় মুক মুখের দিকে তাকালে আমাদের প্রথম করণীয় হওয়া স্বাভাবিক যে, তাদের শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে আশা জাগাতে হবে। এখানে 'আশা' শুধুমাত্র মানসিক স্বস্তি নয়, এর পরিপূরক আস্থা। আশার সাথে প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা সম্পৃক্ত হলেই তা বৃক্ষের মতো বড় হয়ে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করতে পারে। আশা-আকাঙ্ক্ষা জাগানো কিংবা উজ্জীবিত করা মনস্তাত্ত্বিক বিষয়, এটা স্বাধীনভাবে সক্রিয় হয় না বরং কোন প্রপঞ্চে ভর করে সঞ্চালিত হয়। আশার মাঝে উন্নয়নের প্রত্যাশী সম্ভাবনাকে খুঁজে পেলে তখন তা আস্থায় পরিণত হয় –যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটিকে অনুকল্প (hypothesis) হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে যে, টেকসই উন্নয়নের মূলে উন্নয়ন প্রত্যাশীর আস্থা নিপুনভাবে ক্রিয়াশীল থাকে; অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে পরিবর্তিত বা উন্নীত অবস্থা কখনোই টেকসই রূপ নিতে পারে না যদি উন্নয়ন প্রত্যাশী এর মাঝে ইপ্সিত আস্থা খুঁজে না পায়।

এই পরিবর্তন প্রত্যাশীর মাঝে আস্থা জাগিয়ে তুলতে পরিবর্তনের অনুঘটক (catalyst)কে নিয়ে থাকে ধৈর্যনিষ্ঠ ধারাবাহিক কর্ম-প্রচেষ্টা –যা হয়ে থাকে অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে। পরিবর্তনের অনুঘটকের জ্ঞান, আন্তরিকতা, স্বেচ্ছাসেবী মন ও কৌশল একজন হতাশাগ্রস্ত, বিপদাপন্ন, নিরন্ন, নিঃস্ব মানুষকে সচেতন করে তার ভেতরকার সম্ভাবনাকে সক্ষমতায় উন্নীত করার মাধ্যমে আস্থা জাগিয়ে তোলে। এক-কালের প্রাকৃতিক-দুর্যোগ কবলিত বিপন্ন কুন্দেরপাড়া জনপদটিকে আজ অনেকটা নিরাপদ ও সম্ভাবনাময়ী মনে হবার কারণ খুঁজতে গিয়ে এর ভেতরে ও বাইরে জানা ও বুঝার কৌতূহল তাই অনেকটা বেড়ে যায়।

বাংলাদেশের দুর্যোগ কবলিত জনগণের মধ্যে চরের অধিবাসীরা জীবনে অনেকবার নদীভাঙ্গনের সম্মুখীন হয়। এর ফলে তারা ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির মধ্য দিয়ে পতিত হয়ে ক্রমশ নিঃস্ব, ক্ষমতাহীন আর হতাশ হয়ে পড়ে। এরকম অসংখ্য চরের একটি গাইবান্ধা জেলার কুন্দেরপাড়া গ্রাম –যেখানে বন্যা ও নদীভাঙ্গনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত, বিপন্ন এবং খুবই হতাশাগ্রস্ত অনেকগুলো পরিবার স্বাভাবিক ও সক্ষম জনপদের পর্যায়ে পৌঁছানোর আশাদীপ্ত উদাহরণ তৈরী করেছে বলে প্রতীয়মান হয়। এই পরিবর্তনগুলোর ভেতর-বাহির বা

আদ্যপ্রান্তকে অনুধাবন করতে কিছু চিন্তা-প্রণালীকে একটি অভিন্ন ধারায় গ্রন্থিত করার চেষ্টা করা হয়েছে দুটো ভিন্ন মাত্রায় – যার আলঙ্করিক রূপ 'নিসর্গ' ও 'অন্তর'।

বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রতিকার ভাবনা

যে দুটো ইস্যুর উপর কুন্দেরপাড়ার 'নিসর্গ' ও 'অন্তর' বিম্বিত (focused) হয়েছে তা হচ্ছে দুযোর্গ ঝুঁকি হ্রাস ও স্বাবলম্বিতা সৃষ্টি। যে পরিবর্তনগুলোকে এখানে বিশ্লেষণের আওতায় আনা হয়েছে তা হচ্ছে দুযোর্গ ঝুঁকি হ্রাসে সক্ষমতা সৃষ্টি, সার্বিকভাবে একটি জনগোষ্ঠীর জীবন-মান (livelihood) উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন এবং উন্নয়নে জনগোষ্ঠীর নিজস্ব আগ্রহ বৃদ্ধি ও আস্থা সৃষ্টি।

বাংলাদেশের জন্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ তথা বন্যা, জলোচ্ছ্বাস বা ঘূর্ণিঝড় একটি বড় সমস্যা। ভৌগলিক অবস্থান, ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে এদেশে বিভিন্ন সময়ে ব্যাপক ক্ষতি হয়। এসব দুর্যোগ প্রশমনে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগও কম নেয়া হয়নি। বিগত পঁয়ত্রিশ বছরে বাংলাদেশে সরকার দশ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি অর্থ বিনিয়োগ করেছে শুধুমাত্র প্রাকৃতিক বিপদাপন্নতা প্রশমনের লক্ষ্যে।[১] এর মধ্যে বন্যা-ব্যবস্থাপনার রূপরেখা থাকলেও অদ্যবধি বাংলাদেশে সার্বিকভাবে স্থায়িত্বশীল বন্যা-ব্যবস্থাপনা সৃষ্টি হয়নি। বন্যাজনিত দুর্যোগ মোকাবেলায় সরকারের সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি (CDPM)-২০০৩, এবং জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকি মোকাবেলায় পরবর্তীতে গৃহীত Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan -2009-এ কমিউনিটিভিত্তিক দুর্যোগ মোকাবেলা, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, দুর্যোগ-সহনীয় ব্যবস্থা এবং দুর্যোগ-প্রশমন ব্যবস্থা বিশেষভাবে গুরুত্বারোপিত হয়েছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারের ভিশন হচ্ছে দারিদ্র্য বিমোচন এবং সকলের জন্য আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জন। এজন্য অধুনা প্রণীত জলবায়ু পরিবর্তনের কৌশলপত্রেও সরকার দারিদ্র্য বিমোচনকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে।

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম দরিদ্র দেশ এবং দুর্যোগের কারণে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ। বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার বিকল্প দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (পিআরএসপি)-এ দারিদ্র্যের সাথে দুর্যোগের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যোগসূত্র থাকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ২০০৪-এর বন্যার কারণে মাথাপিছু আয় ৪.৫% থেকে ৩.০% এ নেমে আসার সম্ভাবনার তথ্য পিআরএসপিতে উল্লেখ করা হয়েছিল।[২]

বাংলাদেশের জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ১৯৯৭, ২০০৭ ও ২০০৯ -এ নদীভাঙ্গন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত নারী ও শিশুর পুনর্বাসন-এর কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। নারী উন্নয়ন সরকারের অঙ্গীকার এবং এজন্য গৃহীত নীতিমালা অবশ্য-পালনীয়। দুর্যোগে নারীরা বেশী

১. Source: Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan -2009, Ministry of Environment and Forest, Government of the People Republic of Bangladesh.

২. সূত্রঃ পিআরএসপি ও আপনি, ২য় সংস্করণ, সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান (সুপ্র), প্রকাশ ২০০৬

ক্ষতির শিকার হয় এবং চরাঞ্চলের নারীদের অবস্থা হয়ে থাকে অধিকতর বিপদাপন্ন। কারণ এরা সরাসরি নদীভাঙ্গন ও বন্যার সাথে যুদ্ধ করে শিশুসহ নিজেদের জীবন বাঁচায়। চরের কর্মক্ষম পুরুষ বর্ষা মৌসুমে কাজের সন্ধানে অন্যত্র যাওয়ায় নারীরা বেশী ঝুঁকির মধ্যে থাকে। বাংলাদেশের সার্বিক অধিকার চিত্রের অনুকরণে চরের জনগণও নারীর অধিকার মূল্যায়নে সচেতন নয়। নারী ও শিশুদের বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়ে বিবেচনা করার কোন সংস্কৃতিও সেখানে গড়ে ওঠেনি। তাই বাস্তবিক, পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে নারী ও শিশুর অগ্রাধিকার পরিকল্পনা কখনোই সফল হয় না।

বন্যা ও নদীভাঙ্গন-কবলিত জনপদের উন্নয়ন প্রেক্ষাপট

বন্যা ও নদীভাঙ্গন সম্পর্কে চরাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের স্বাভাবিক বিশ্বাস হচ্ছে এগুলো নিয়তির বিধান। প্রাকৃতিক-দুর্যোগ প্রশমনে তাদের বহুবিধ লোকজ জ্ঞান (indigenous knowledge) এবং কোন কোন ক্ষেত্রে দক্ষতা থাকলেও বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে এসবের প্রযোজ্যতা ও উপযোগিতা ছিল না অনেককাল। এসব সীমাবদ্ধতার মধ্যে রয়েছে সঠিক পরিকল্পনার অভাব, সংঘশক্তির অভাব, শিক্ষার অভাব, তহবিলের অভাব, সরকারি-বেসরকারি আনুকূল্যের অভাব, কুসংস্কার ইত্যাদি। এই সবকিছুর সুষম-সম্মিলনে দুর্যোগের ক্ষয়-ক্ষতি প্রশমন অনেকটাই যে সম্ভব তা আমরা প্রত্যক্ষ করি এই সমীক্ষায়।

বন্যা ও নদীভাঙ্গন বাংলাদেশের জনপদকে নানাভাবে অস্থির করে –যা দেশের মৌলিক উন্নয়নের পথে অন্তরায় হয়। দুর্যোগ-কবলিত পরিবার সাময়িক বা চিরতরে সামাজিক পর্যায় থেকে অবস্থানচ্যুত হয়। খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, শারিরীক ও মানসিক স্বাস্থ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারী ও শিশুসহ কবলিত জনগণ চরম ক্রান্তিকাল অতিবাহিত করে। বিপুল সংখ্যক পরিবার প্রতিবছর বন্যায় হারায় তাদের আশ্রয়, অনেক শিশুই আর ফিরে পায়না তার শিক্ষাজীবন, টাকার অভাবে মেয়ের বিয়ে হয়না, স্ত্রীকে তালাক দেয় কেউ, কেউ বা স্ত্রী-সন্তান ফেলে অনির্দিষ্টকালের জন্য হয় দেশান্তরী, সর্বস্ব হারিয়ে শহরের ফুটপাত, গঞ্জ, রেলস্টেশনের বস্তিবাসী হয়ে অমানবিক জীবন-যাপনে বাধ্য হয় এরা। তৈরী হয় নানাবিধ সামাজিক সমস্যা।

শুধু সামাজিক ক্ষেত্রেই নয়, দীর্ঘমেয়াদী মনোঃসামাজিক প্রভাবও পরিলক্ষিত হয় প্রাকৃতিক-দুর্যোগ পরবর্তী দরিদ্র জনপদের মধ্যে। আগে যারা খেয়ে পড়ে চলতে পারতো, বাস্তুভিটা আর সহায়সম্বল হারিয়ে তারা সহসাই নিজেদেরকে সমাজের অপেক্ষাকৃত অধস্তন অবস্থায় দেখতে পায় –যা তাদের আত্মবিশ্বাসকে বিক্ষত করে। সারা জীবন কষ্টার্জিত শ্রমের মাধ্যমে জীবন-নির্বাহ করেও যারা ভেবে সান্ত্বনা পেত যে –কারো কাছে হাত পাততে হয় না– সহসাই তার জন্য ত্রাণ কিংবা ভিক্ষাই সর্বশেষ অবলম্বন হয়ে পড়ে। এই গ্লানি তার মাঝে মনোঃসামাজিক জটিলতা তৈরী করে। এখানে একটা পর্যবেক্ষণকে উল্লেখ করা জরুরী যে, গাইবান্ধার চরের জনগোষ্ঠীর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ভিক্ষার বিপক্ষে –যার বিপরীত চিত্র দেশের কোন কোন বিশেষ অঞ্চলসমূহে পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে। ক্ষয়ক্ষতির শিকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত জনগণের নাজুক অবস্থান থেকে উত্তরণ করা শুধু দুরূহ নয়, বড় ধরনের চ্যালেঞ্জও বটে। এর পরিপূরক হিসেবে দরকার হয় নতুন করে বহুমাত্রিক ও দীর্ঘমেয়াদী সামাজিক

বিনিয়োগ। যদিও আমাদের দেশে প্রচলিত দুর্যোগ প্রশমন ব্যবস্থায় সামাজিক বিনিয়োগ-ক্ষেত্র অনেক প্রশস্ত তারপরেও পরবর্তী জরুরী ইস্যু 'মনস্তাত্ত্বিক বিনিয়োগ'-এর ক্ষেত্রে যত্নবান হবার তেমন কোন নজির নেই। অথচ, দুর্যোগ নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর জন্য অপরাপর সেবার সাথে মনোঃসামাজিক চিকিৎসা (psycho-social treatment) যুক্ত হলে তা হতে পারতো অধিক ফলদায়ক; বিশেষ করে এটা জরুরী হয়ে পড়ে পুনরায় তাকে সামাজিক জীবনের উপযোগী করে প্রতিস্থাপনের জন্য। ২০০৫ সালের সর্বগ্রাসী নদীভাঙনের কবল থেকে কোনরকমে বেঁচে যাওয়া লাভলী বেগম যদিওবা অন্যান্য সহযোগিতা পেয়েছিল কিন্তু তারমধ্যে ভীষণভাবে অনুভূত হয়েছিল মানসিক ক্ষতটি: *"হামি যখন খালি হাতত হামার তিন্যাটা ছৈল আর গরীব সোয়ামী সাতকরি আশ্রয় কেন্দত আনু তখনে হামার ছোলে শ্যাষ। তখনে হামার দুঃখে সান্ত্বনা দ্যাওয়ার কায়ক উটকি পাম নাই।"* ["যখন আমি শূণ্য হাতে তিনটি বাচ্চা আর দরিদ্র স্বামীর সাথে আশ্রয়কেন্দ্রে এসেছি ততক্ষণে আমার সম্পত্তি সব শেষ। কিন্তু সান্ত্বনা দেবার কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি"]

প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিতদের ক্ষয়ক্ষতিকে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক মানদণ্ডে বিচার করা হয় বলেই ক্ষয়ক্ষতির প্রভাব যথাযথভাবে নিরূপন সম্ভব হয় না। ধরা যাক কোন পরিবারের অনেক কষ্টে দীর্ঘদিনের সঞ্চয় তাদের কুড়ে ঘর, গরুবাছুর ও সাংসারিক সম্পত্তি –সবকিছু বন্যা ভাসিয়ে নিলো। এক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ শুধু তার ভাসিয়ে নেয়া জিনিষপত্রের দামের সমান বিবেচনা করলে সমীচীন হবে না। ঐ জিনিষগুলো করতে তাদের যে সময়, ত্যাগ (সাধারণত কোন ত্যাগের মাধ্যমে সাশ্রয় করেই দরিদ্র পরিবার সম্পদ করে থাকে), যে আকাঙ্ক্ষা ব্যয় করেছে -দুর্যোগে তা লণ্ডভণ্ড হয়েছে। পরবর্তীতে আবার যখন নতুন করে জীবন শুরু করে তখন ঐ ক্ষতি পুষিয়ে জীবন-নির্বাহের পর খুব কমই আছে যারা নতুন করে সম্পদ তৈরী করতে পারে। স্বাভাবিকভাবে একটি পরিবারের উন্নয়ন যে হারে অগ্রসর হয় দুর্যোগ সেই রৈখিক স্কেল ভেঙ্গে আবার পেছন থেকে শুরু করতে বাধ্য করে। নতুন করে শুরু করার পর পুরনো গতি ও স্পৃহা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সুষমভাবে অগ্রসর হয় না।

প্রাকৃতিক-দুর্যোগ কবলিত জনগণের তাৎক্ষণিক এবং প্রধান রাজনৈতিক সমস্যা তৈরী হয় তার পরিচিতির (identity) ক্ষেত্রে। মূলত বাস্তুভিটা হারানোর বিপদাপন্নতাই তাকে বহুবিধ রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। এদেশে দরিদ্রদের অধিকার-বঞ্চিত করার সংস্কৃতি, সেই সাথে রাজনৈতিক সচেতনতায় অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে থাকা চরের জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা সৃষ্টি হয় মূলত দুটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। এক, দরিদ্র চরবাসীকে ক্ষমতাহীন রেখে শ্রেণীবিশেষের রাজনৈতিক ফায়দা লাভ ও শোষণ; এবং দুই, রাজনীতির নেতিবাচক ধারায় তাদেরকে ব্যবহার। চরবাসীদের রাজনৈতিক প্রত্যাশাও অনেকটা সীমাবদ্ধ। এর সাথে প্রধান যোগ চরের খাস জমি, জলমহালে কিংবা মধ্যসত্ত্বভোগীদের নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন উপার্জনের উৎসে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আশ্রয় লাভ। কিন্তু শ্রম ও মজুরী, কর্মসংস্থান, সরকারি-বেসরকারি সেবা ও স্থানীয় সম্পদে প্রবেশাধিকার, গণ-প্রতিনিধিত্ব ও ভোটাধিকার নিরাপত্তা, ইত্যাদি বিষয়ে তাদের সীমাবদ্ধতা ব্যাপক –যার অনেক পরিবর্তন দেখা যায় কুন্দেরপাড়ায়। বিশেষ করে বলতে হয়, কুন্দেরপাড়ার সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনায় স্থানীয় নারী-পুরুষ বিভিন্ন কমিটিতে সক্রিয় থেকে ভূমিকা রাখছে

–যা তাদের রাজনৈতিক সচেতনতারই বহিঃপ্রকাশ। অবশ্য এসব ক্ষেত্রে পরিবর্তনের অনুঘটকদের আন্তরিকতা ও সংবেদনশীলতা ছিল যথার্থ।

চরের সংস্কৃতিতে নারীর প্রতি সহিংসতা, যৌতুক, বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহের উচ্চহার পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বৈষম্য নৈমিত্তিক বিষয়। বিগত পনের বছরে কুন্দেরপাড়ার প্রাকৃতিক-দুর্যোগ কবলিত জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক উন্নয়নের মধ্যে নারীর ক্ষমতায়ন অনেকাংশে পরিলক্ষিত হয়েছে। সকল ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণও বেড়েছে। নারী-শিক্ষা, নারীর নিজস্ব আয় এসব এখন সেখানে আশাবাদী চিত্র। অবশ্য যৌতুকের আধিক্য এই অর্জনকে অনেকটাই ম্লান করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে (বিগত প্রায় এক দশকে) যৌতুকের উচ্চহারের[৩] কারণ নির্ণয়ে এখনোবধি কোন সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয়নি। যৌতুকের বিপক্ষে আইন ও জনমত থাকলেও তা কার্যকর না হবার কারণগুলো নির্ণয় এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

প্রত্যন্ত ও দুর্গম চরগুলোতে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পায়নি, তবে আধুনিকতার ছোঁয়া হিসেবে সেল ফোন খুবই কার্যকরী হচ্ছে। বেশিরভাগ চরে বিদ্যুতায়ন না হওয়ায় যান্ত্রিক সমৃদ্ধি ঘটেনি। জ্বালানী তেল ব্যবহার উপযোগী কিছু ইঞ্জিনের ব্যবহার দৃশ্যমান। সীমিত পরিসরে সৌরবিদ্যুৎ-এর ব্যবহার লক্ষ করা গেছে।

বিরাজমান এতসব সমস্যা সত্ত্বেও চরের উন্নয়নে দীর্ঘকাল কেউ এগিয়ে না আসার কারণ হয়তো দুটি: এক. ঝুঁকির আধিক্যের কারণে লক্ষ্যমাত্রা পূরণের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা এবং দুই. স্থায়িত্বশীলতার প্রশ্ন। কিন্তু যে ঝুঁকি গ্রহণে পিছপা হন একজন বাণিজ্যিক উদ্যোক্তা ঠিক সেখানেই এগিয়ে যান একজন উন্নয়ন কর্মী –যার রয়েছে আত্মিক ও পেশাদারী প্রতিশ্রুতি। সেরকম ধারণা থেকেই কুন্দেরপাড়ায় বিগত পনের বছরের বাস্তবায়িত বিভিন্ন কর্মসূচির প্রভাব অনুধাবন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, গাইবান্ধার নদীবর্তী চর সম্পর্কে খুব বেশী আর্কাইভ তথ্য না থাকায় আমাদের একটু পেছনে যেতে হয়েছে। ১৭৮৭ সালের ভূমিকম্পের পর নদীর গতিপ্রবাহ বদলে যাওয়ার ফলেই যে এখানকার চরগুলোর দুর্দশা বেড়েছে তা সন্দেহাতীতভাবে অনুমান করা যায়। বস্তুত, বাংলাদেশের নদীপ্রবাহের বর্তমান ভূ-প্রাকৃতিক মানচিত্রে ১৭৮৭ সালের ভূমিকম্পের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উল্লেখ্য যে, এতদঞ্চলে সমসাময়িক কালের রাজনৈতিক ইতিহাস (ফকির মজনু শাহ এর বিদ্রোহ ১৭৬৩, রংপুরের কৃষক বিদ্রোহ ১৭৮২) সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচলিত হলেও বাংলাদেশে যমুনা ধারার জন্ম-ইতিহাস ততটা অবিসংবাদিত নয়।[৪]

---

৩ গবেষণা পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান 'সহযোগী' কর্তৃক ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে নভেম্বর-২০০৬ এ পার্বতীপুরে এফজিডি, মে- জুন ২০০৯ সালে গাইবান্ধার দুটি জরিপ (প্রায় ৬২৫০ টি খানা) এবং ২০ টি এফজিডি অনুষ্ঠিত হয়। মন্তব্যটি এসব সমীক্ষার ফলাফলের গড়।

৪ প্রাসঙ্গিক তথ্য। ১৮৮২ সালে রচিত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দেবী চৌধুরাণী' নামক ঐতিহাসিক উপন্যাসে চিত্রিত বিভিন্ন ঘটনার প্রাসঙ্গিকতায় অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকের বাহারবন্দ পরগনা তথা তৎকালিন গাইবান্ধা (যা পরে ভবানীগঞ্জ হিসেবে প্রসিদ্ধ লাভ করে) এলাকার বন্যা-সংকুলতা এক্ষেত্রে লক্ষণীয়।

যমুনা নদীতে ৫৬টি বৃহদাকার চর বা দ্বীপ রয়েছে যাদের প্রতিটি ৩.৫ কিলোমিটারের অধিক দীর্ঘ। বাংলাদেশে ১৯৮১ সাল থেকে ১৯৯৩ সালের মধ্যে প্রায় ৭,২৯,০০০ মানুষ নদীভাঙ্গনের ফলে গৃহহীন হয়েছে যাদের অর্ধেকেরও বেশি ছিল যমুনার তীর ভাঙ্গনের শিকার।[৫]

গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (জিইউকে) এর উন্নয়ন অংশীদার অক্সফাম-জিবির সহায়তায় চরাঞ্চলের জনগণের মধ্যে দুর্যোগে জরুরী উদ্ধার ও ত্রাণ তৎপরতা, দুর্যোগ পূর্ব-প্রস্তুতি, দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসনসহ বন্যাজনিত দুর্যোগের ঝুঁকি ও ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস, টেকসই প্রাকৃতিক-দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উপর লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীকে সক্ষম ও দক্ষ করার মধ্য দিয়ে তাদের স্বাবলম্বিতা সৃষ্টি তথা উন্নয়নমূলক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। জিইউকের এসব কর্মসূচির মধ্যে পরিবার ও সমাজে নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ, জীবন-মান উন্নয়ন (শিক্ষা, কৃষি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, আয় ও কর্ম সংস্থান, স্বাস্থ্য, নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, মা ও শিশু স্বাস্থ্য প্রজনন স্বাস্থ্য, খাদ্য ও পুষ্টি ইত্যাদি), সাংগঠনিক সক্ষমতা অর্জন, সরকারি ও অন্যান্য সেবা নিশ্চিতকরণ, নাগরিক অধিকার ও সুশাসন, প্রতিবন্ধিদের প্রতি বিশেষ-ব্যবস্থা গ্রহণ, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন, দরিদ্রদের সম্পদে প্রবেশাধিকার, সুশাসন, এইচআইভি/এইডস ইত্যাদি ইস্যু সম্পর্কিত হয়।[৬]

কুন্দেরপাড়ার জনগণের অন্তর্নিহিত যে শক্তির পরিচয় এই সমীক্ষা থেকে স্পষ্ট হয়েছে তা হচ্ছে তাদের আস্থা। চরের মাঝামাঝি নির্মিত বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র যেন এই গ্রামের আস্থার মেরুদণ্ড। সারা গ্রামে যে সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রশমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তার ফলে আশাহীন জনগণ পুনরায় আশা ফিরে পেয়ে তাদের কর্মউদ্যোগ চালিয়ে যাচ্ছে।

দুই : গবেষণার মৌলিক বিষয়াদি

গবেষণা নকশা

বাংলাদেশের বন্যাপীড়িত অঞ্চলগুলোর মধ্যে গাইবান্ধা জেলা অন্যতম। যমুনা, তিস্তা, ব্রহ্মপুত্র ও ঘাঘট নদীর কারণে গাইবান্ধায় এ সমস্যা হয়। কুন্দেরপাড়া গ্রামটি গাইবান্ধা সদর উপজেলার কামারজানি ইউনিয়নে অবস্থিত। কুন্দেরপাড়া চরের বর্তমান বয়স প্রায় একুশ বছর (১৯৮৮-২০০৯)। চরে মানুষের বসতি গড়তে এবং বসবাস উপযোগী হতে প্রথমদিকে কয়েক বছর সময় নিয়েছে। ১৯৯৫ সাল থেকে এই চরে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (জিইউকে) চরবাসীর উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে। ১৯৯৫-২০০৯, এই পনের বছরে চরের অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এসব পরিবর্তন প্রকৃত পক্ষে কতটা প্রভাবদায়ী তা বের করে আনার চেষ্টা করা হয়েছে চরবাসীর নিজস্ব উপলব্ধি ও অনুভূতি থেকে।

---

৫. সূত্রঃ যমুনা নদী, বাংলা পিডিয়া, দি এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৬।

৬. গণ উন্নয়ন কেন্দ্র প্রকাশিত বিভিন্ন বার্ষিক প্রতিবেদন ও কর্মসূচি প্রতিবেদন।

কুন্দেরপাড়ার উন্নয়নের জন্য গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পভিত্তিক কর্মসূচির প্রভাব মূল্যায়নের পূর্বে কিছু ধারণাগত অনুকল্প তৈরী করা হয়। তা হচ্ছে, কুন্দেরপাড়ায় বিগত পনের বছরে বাস্তবায়িত কর্মসূচিগুলোরমাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, ক্ষয়ক্ষতি প্রশমন ও সক্ষমতা সৃষ্টি সফলভাবে সম্ভব হয়েছে এবং জনগণ নিজ থেকেই এসব কার্যক্রমে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। অর্থাৎ এসব কর্মসূচি বাস্তবায়িত না হলে কুন্দেরপাড়ার উন্নয়ন এর চেয়ে অনেক কম হতো কিংবা হতো না। এসব অনুকল্প চিত্রিত হয় তিনটি মৌলিক প্রশ্নের মধ্যে দিয়েঃ

এক – চরের প্রাকৃতিক দুর্যোগ-ঝুঁকি ও ক্ষয়ক্ষতির প্রভাব কতটা?

দুই – চরের জনগণের জীবন-মান কতটা বিপদাপন্ন?

তিন – পরিবার ও সমাজে নারীর অবস্থা ও অবস্থান কতটা নাজুক?

এসব প্রশ্নগুলোর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে, চরের প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি অত্যন্ত ভয়াবহ। চরের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম প্রতিবন্ধকও এই বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ। বন্যা, নদীভাঙ্গন, খরা, শৈত্য প্রবাহ, ঝড় সব কিছুই চরের মানুষের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রাকে ব্যহত করে। চরের জীবন-মান একেবারেই অনুন্নত। এর সর্বত্রই রয়েছে নিঃস্ব ও ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের হতাশ চিত্র। চরে তাদের সহায়তা করার কেউ নেই তবে তাদের ব্যবহার তথা শোষণ করে ফায়দা লুটার জন্য রয়েছে সুবিধাবাদী শ্রেণী। সরকারি সুবিধা, সেবা ও স্থানীয় সম্পদে প্রবেশাধিকার অত্যন্ত সীমিত এবং এজন্য তাদেরকে অনেক কাঠ-খর পোড়াতে হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এসব পরিবারের স্বাবলম্বী হবার পথে আরেক বাধা হচ্ছে মনোঃসামাজিক সমস্যা, যার কারণে নিজেদেরকে তারা অপেক্ষাকৃত অধস্তন ভাবতে থাকে। দুর্যোগ তাদের মনোবলকে ভেঙ্গে দেয়, ফলে নতুন করে জীবন গড়ার স্পৃহায় যথেষ্ট বেগ আসে না। চরের নারীরা ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সমাজ-জীবনে অত্যন্ত অসহায়, নির্যাতিত, অবমূল্যায়িত এবং সহিংসতার শিকার। সমাজের শ্রেণী-বিশেষ তাদের চির বিপক্ষবাদী। চরের জনগণের মধ্যে ঐক্য বা সংহতি সৃষ্টির কোন ইতিবাচক ধারা নেই, প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দরিদ্রদের প্রতিনিধিত্ব নেই। চরের অধিবাসীরা মূলভূমির অধিবাসীদের থেকে 'অধস্তন' বিবেচনায় অবমূল্যায়িত হয়। চরের কৃষিতে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নেতিবাচক প্রভাব এখন অনেকটাই স্পষ্ট।

সমীক্ষা থেকে আরো যে সকল বিষয় পাওয়া গেছে তা হচ্ছে, সরকারের নীতি ও পরিকল্পনায় চরের প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও চরবাসীর জীবন-মান উন্নয়নে রূপরেখা থাকলেও তা বাস্তবায়নে কোন নিবিড় উদ্যোগ গৃহীতি বা কার্যকর হয়নি। ঝুঁকির পরিমাণ বেশী থাকায় এবং ফলাফল অর্জন কষ্টসাধ্য হওয়ায় চরবাসীর জীবন-মান উন্নয়নে ধারাবাহিক বেসরকারি উদ্যোগও ততটা পরিলক্ষিত নয় যতটা দেখা যায় ক্ষুদ্র ঋণের মতো লাভজনক ক্ষেত্রে। সর্বশেষ আমরা দেখেছি যে অক্সফাম-জিবির সহায়তায় ও গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রচেষ্টায় একটি ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ করা গেছে। অর্থাৎ, উপযুক্ত সুযোগ ও সহায়তা পেলে চরবাসীরা নিজেরাই তাদের পরিবর্তন তথা উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম। এসব বিষয় বিবেচনা করে কুন্দেরপাড়ার পরিবর্তিত অবস্থার বিশ্লেষণী চিত্র উপস্থাপনের উদ্দেশ্য স্থির করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য ও প্রত্যয়

উপরোক্ত ধারণাগত অনুকল্প ও তার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণকে সামনে রেখে এই সমীক্ষার উদ্দেশ্য মূলত দুটো প্রধান পরিসর নিয়ে আলোচনা করা। প্রথমত, কুন্দেরপাড়ার প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও এর ক্ষতি প্রশমন বিষয়ক এবং দ্বিতীয়ত, কুন্দেরপাড়ার জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক জীবন-মান উন্নয়নে চরবাসীর স্বাবলম্বিতা সৃষ্টি ও নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ে আলোকপাত।

এসব উদ্দেশ্যের আলোকে যে দুটো প্রত্যয়ের উপর সমীক্ষাটি কেন্দ্রীভূত হয়েছে তা হচ্ছে:

১. প্রাকৃতিক-দুর্যোগ প্রশমন
২. স্বাবলম্বিতা সৃষ্টি।

'দুর্যোগ' বলতে এখানে প্রথমত শুধুমাত্র নদীর প্রবাহ, প্রবল স্রোত, বৃষ্টি বা উজানের ঢলে সৃষ্ট বন্যা, এবং দ্বিতীয়ত নদীভাঙ্গন তথা নদীর তীর ভেঙ্গে নদীগর্ভে বিলীন হওয়াকে বুঝায় -যা ব্যাপকভাবে প্লাবিত বা সঞ্চালিত হয়ে চরাঞ্চলের জনপদ, শস্যক্ষেত, গাছপালা, রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি, গবাদি পশুপাখি বা অন্যান্য সম্পদের সম্পূর্ণ বা আংশিক ক্ষতিসাধন করে এবং যার মাধ্যমে স্বাভাবিক জনজীবন বিঘ্নিত বা বিপর্যস্ত করে –এসব অবস্থাকে বুঝায়। পরোক্ষভাবে, উপরোক্ত বিপদাপন্নতার কারণে আবাদী জমি অনুর্বর হয়ে পড়লে, রোগ-ব্যাধি ছড়িয়ে পড়লে, সম্পদ হানি বা বাস্তুহারা হলে কিংবা সুযোগ বা অধিকার বঞ্চিত হয়ে পড়লে তা-ও দুর্যোগের প্রভাব হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

'স্বাবলম্বিতা সৃষ্টি' প্রত্যয়টি মূলত দুইভাবে আলোচিত হয়েছে। প্রথমত, প্রাকৃতিক-দুর্যোগ মোকাবেলায় স্বাবলম্বিতা সৃষ্টি এবং দ্বিতীয়ত, জীবন-মান উন্নয়নে স্বাবলম্বিতা সৃষ্টি। উভয়ক্ষেত্রে 'নারীর ক্ষমতায়ন' ও 'সাংগঠনিক সক্ষমতা' ক্রসকাটিং ইস্যু হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

প্রথম প্রত্যয়ে বিশেষায়িত দুর্যোগগুলোর মোকাবেলায় *স্বাবলম্বিতা সৃষ্টি* বলতে চরের অবকাঠামো উন্নয়ন এবং জনগোষ্ঠীকে সচেতনকরণ ও তাদেরকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষ ও সক্ষমকরণ (capacity building)কে বুঝিয়েছে।

জীবন-মান (livelihood) বলতে একটি নিরাপদ ও বিপদাপন্নতার ঝুঁকিমুক্ত জীবনের নিশ্চয়তার পাশাপাশি মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার বিভিন্ন নির্দেশককে চিহ্নিত করা হয়েছে, যেমন আশ্রয়, খাদ্য, বস্ত্র, আয়-ব্যয়, স্বাস্থ্য, কৃষি ও অন্যান্য কর্মসংস্থান, শিক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা, পারিবারিক ও সামাজিক শান্তি ও মর্যাদা, সামাজিক স্বীকৃতি, মতামত ও সিদ্ধান্তগ্রহণ, কমিউনিটির অংশ হিসেবে বিবেচিত হওয়া ইত্যাদি বুঝিয়েছে।

'নারীর ক্ষমতায়ন' বলতে নারীর অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা এবং পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীর মর্যাদা ও স্বীকৃতিকে বুঝানো হয়েছে। নারীর নিজস্ব আয়মূলক সক্ষমতা ও কর্মসংস্থান, সিদ্ধান্তগ্রহণ ক্ষমতা, মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা ও মূল্যায়ন, নির্যাতন ও সহিংসতামুক্ত পরিবেশ, নারীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য অধিকার ও অগ্রাধিকারগুলো এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

'সাংগঠনিক সক্ষমতা' বলতে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দরিদ্র চরবাসীর ঐক্য, সংহতি, সম্মিলিত প্রয়াস, গণতন্ত্রের চর্চা, অন্যায়ের প্রতিবাদ, অধিকার আদায়ে বদ্ধপরিকর ও নিয়মতান্ত্রিক প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা অর্জনকে বুঝানো হয়েছে।

মেয়াদকাল

এই সমীক্ষার জন্য নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০০৯-এ মাঠ-পর্যায়সহ বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগৃহীত হলেও তা যাচাই বাছাই এর জন্য ২০১০ এর মার্চ অবধি অব্যাহত থাকে – এমনকি মাঠ-পর্যায়েও।

ব্যবহৃত পদ্ধতি

একটি *গুণগত* সমীক্ষার বিষয়বস্তুকে স্থির করে মোটামুটি অনেকগুলো পদ্ধতি এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। পুরো সমীক্ষার জন্যই একটি একক *ঘটনা অনুধ্যান (case study)* পদ্ধতি বিবেচনা করে তার রীতিতে তথ্য-উপাত্তের সন্নিবেশ ঘটানো হয়েছে। কয়েকটি ধাপে সম্পন্ন হয়েছে তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম। এই গ্রামের সামগ্রিক উন্নয়নে এ পর্যন্ত যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে প্রথমেই সেসব বিষয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, আমাদের জানা মতে, এই সমীক্ষাটিই এখন পর্যন্ত কুন্দেরপাড়ার উপর অনুষ্ঠিত একক কোন গবেষণা।

প্রথম ধাপে কুন্দেরপাড়ায় বিভিন্ন সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা গণ উন্নয়ন কেন্দ্র থেকে এবং কুন্দেরপাড়ার সচেতন জনগণের নিকট থেকে এই তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। এসব তথ্য সংগ্রহে *সাহিত্য সমীক্ষণ (literature review/ secondary sources of information)* ও *বিষয়ভিত্তিক-সাক্ষাৎকার (focused interview)* পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়েছে। সাহিত্য সমীক্ষণে কুন্দেরপাড়ার উপর প্রণীত বিভিন্ন প্রকল্প প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট জরিপ প্রতিবেদন, সংস্থার সম-সাময়িক কালের বেশ কিছু বার্ষিক প্রতিবেদন, বুলেটিন ও সাময়িকী এবং কর্মসূচি ও মনিটরিং ডকুমেন্ট ঘেঁটে দেখা হয়।

দ্বিতীয় ধাপে কুন্দেরপাড়ার উপকারভোগীর উপর প্রণীত আগের কিছু *কেসস্টাডি* এবং আলোকচিত্রও তথ্য সংগ্রহের আওতাভুক্ত হয় তবে ঐসব সূত্র ধরে সংশ্লিষ্ট উপকারভোগীর নিকট পুনরায় উপস্থিত হয়ে সাক্ষাৎকার গ্রহণের পর যাচাই বাছাই ও প্রমাণ সাপেক্ষে প্রাপ্ত তথ্য উক্ত সমীক্ষায় গৃহীত হয়। তুলনামূলক সময়ের তথ্যপ্রাপ্তির সুবিধার্থে এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়।

তৃতীয় ধাপে কুন্দেরপাড়ায় গবেষক দলের উপস্থিতিতে বিভিন্ন দলীয় বিভাগে *ফোকাস দল আলোচনা (FGD)* এবং *আধা-কাঠামোবদ্ধ বা ফোকাসড সাক্ষাৎকার* গ্রহণ করা হয়। এসব এফজিডির মধ্যে রয়েছে উপকারভোগী ও সমিতির সদস্য নারী দল, বিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রী দল এবং এলাকার গণ্যমান্য সভ্যদের দল। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর মধ্যে রয়েছে সমিতির সদস্য, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, বন্যা আশ্রয় কমিটির সভাপতি এবং সাবেক ও বর্তমান ইউপি সদস্য। এছাড়া *গবেষকের পর্যবেক্ষণ* একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত হয়েছে এই সমীক্ষায়।

সীমাবদ্ধতা ও উত্তরণ

অত্যন্ত সীমিত তহবিল এবং একই কারণে বরাদ্দকৃত সময়সীমা এই গবেষণার জন্য অন্যতম সীমাবদ্ধতা ছিল- একথা বলা যায়। এক্ষেত্রে উপলব্ধি ছিল *'এথনোগ্রাফিক পদ্ধতি (ethnographic method)'*র প্রয়োগের যা'র মাধ্যমে হয়তো এই জনপদের ধারাবাহিক পরিবর্তনের নিখুঁত চিত্র উপস্থাপন সম্ভব হতো – কিন্তু গৃহীত প্রস্তুতিতে তা ছিল অসম্ভব। এতদসত্ত্বেও চরের সমস্যার মধ্যে সমসাময়িক অনেকগুলো ইস্যু যথেষ্টভাবে বিশ্লেষণ সম্ভব হয়নি। এর মধ্যে রয়েছে দলীয় রাজনৈতিক প্রভাব, সাম্প্রদায়িক প্রভাব, সাংস্কৃতিক প্রভাব, অপ-সংস্কৃতি ও অরাজক কিছু পরিস্থিতি যেমন চাঁদাবাজী, ঘুষ, প্রভাবশালীদের দখল ও শোষণ প্রবণতা ইত্যাদি –যা দরকার ছিল। নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়ন ইস্যুগুলোর খুব গভীরে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। বছরভিত্তিক আয়, ব্যয়, সচেতনতার মাত্রা ইত্যাদি সম্পর্কে কোন রেটিং স্কেল প্রণয়ণ সম্ভব হয়নি। তুলনামূলক পর্যালোচনা না করার কারণে ফলাফলের যথার্থতা নিরূপনও সুচারুভাবে সম্ভব হয়নি।

গবেষণার ক্ষেত্রে এসব সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় ছিল এবং এর মধ্যে থেকেই গুণবাচক গবেষণা সম্পন্ন করতে যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন ও ধৈর্য-ধারণের মাধ্যমে মান নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয়েছে। অনেক ধরণের সীমাবদ্ধতা উত্তরণে এতদঅঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে সম্পন্নকৃত সমজাতীয় কাজে গবেষকের পূর্ব-অভিজ্ঞতা সহায়ক হয়েছে।[৭]

৭ প্রাসঙ্গিক তথ্যঃ এই গবেষক সম্প্রতি এসকল এলাকায় (গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম ও দিনাজপুরে) মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে বিভিন্ন সমীক্ষা সম্পন্ন করেছে। এছাড়া গাইবান্ধার চরাঞ্চলের জনগণের জীবনমানের উপর ২০০০ সাল থেকে বিভিন্ন উন্নয়ন সংগঠনের সাথে তথ্যসংগ্রহ ও ডকুমেন্টেশন করে আসছে। এসকল অভিজ্ঞতাই এক্ষেত্রে বিভিন্ন পূর্বানুমান তৈরীতে সংশ্লিষ্ট হয়েছে।

অধ্যায়-১

কুন্দেরপাড়ার প্রাগৈতিহাস

অপসৃয়মান ইতিহাস

ঝিনাই আর কোনাই।[৮] প্রায় অবলুপ্ত এই নাম দুটিই ছিল এই এলাকার জীবন ও জনপদের অত্যন্ত প্রিয় ও নিত্যব্যবহার্য। নাম দুটোর মতোই সহদোর ছিল তাদের স্বভাব, গতি-প্রকৃতি, বর্ষায় উছলে উঠা কিংবা ফাগুনে পলোওয়ালাদের ঝাপটায় ঘোলা ফেনিল উচ্ছ্বাস। তখনো এদের বুকে উজানে পাল তুলে মাঝির সুর অনুরণিত হতো। শীতে বাহক কাঁধে জোয়ান কৃষক মাটির কলসে জল নিয়ে ধানের কচি সবুজ বীজতলা ভাসাতো। ঘাটে নানা বর্ণের ও ধর্মের সব-বয়সী নারী-পুরুষ একসাথে গোসল করতো আর গরু নিয়ে রাখাল সাঁতরে এপার-ওপার করতো। বেদেরা কোমরে রাখা জালের থলেতে ঝিনুক-কুড়িয়ে ভরে ফেলতো। পাশেই ডুবসাঁতারের খেলায় প্রতিযোগিতায় নামতো পাতি-হাঁস আর পানকৌড়ি।

নদীবর্তী জীবনের প্রাত্যহিক এই ছবিগুলো অপরিচিত নয় আমাদের গ্রাম-বাংলায়। যদিও আমরা এখানে যে সময়ের কথা ভাবছি- তা আজকের নয়, প্রায় সোয়া দুইশত বছর আগের। হ্যাঁ, আজও এই ছবি আমাদের কাছে বড় আপন। অনুভূতিতে নাড়া দেয় এইসব নিরুত্তাপ ব্যস্তঘড়ির কাঁটা থেমে যাওয়া জীবন, ফসলের মাঠে কৃষকের হাসি, জালে টান দিতেই কম্পনে বুঝতে পারা জেলের শক্ত হাতের শিহরণ, ভরদুপুরে কাঁথা সেলাই আর পানের বাটা নিয়ে রমণীকুলের সুখ-দুঃখের গল্প কিংবা জ্যোৎস্না রাতে দরবারী-উঠোনে প্রাণ পাওয়া সত্যপীর, চন্দ্রভান আর কারবালার গান।

এই ছবিগুলো বাংলার পল্লী-প্রকৃতির জন্য স্বাভাবিক বা চিরন্তন মনে হলেও সবসময়ে তা স্বাভাবিক থাকেনি। অনেক ক্ষেত্রেই এই স্থান দখল করে থাকতো প্রচণ্ড দুঃখ, প্রলয়ঙ্করী তাণ্ডব, দুর্যোগের করাল গ্রাস কিংবা নীলকরদের নির্যাতন। জন্ম ও মৃত্যুর মাঝামাঝি খুব সামান্যই ভেদরেখা টেনে যে গুটিকতক মানুষ তাদের বংশ-ধারা টিকিয়ে রাখতে পেরেছিল, স্থানান্তরের দীর্ঘ সময় পরে হলেও তারাই বার বার ফিরে এসেছে এই জনপদে।

৮ প্রাসঙ্গিক তথ্যঃ ঝিনাই নদীর একটি ক্ষীয়মান ধারা টাঙ্গাইল জেলায় প্রবাহমান।

প্রসঙ্গটি বর্তমান গাইবান্ধা জেলার অর্ন্তগত ব্রহ্মপুত্র-যমুনার চর-জনপদের। গাইবান্ধা তখন বাহরবন্দ পরগণার অর্ন্তভূক্ত। গাইবান্ধা এলাকার পূর্ব সীমানা বরাবর যমুনা-ব্রহ্মপুত্র ধারা তখন শুধুই ব্রহ্মপুত্র ছিল। এর শাখা-প্রশাখার মধ্যে দুটি ছিল ঝিনাই আর কোনাই নদী।[৯] ১৭৮৭ সালে বাংলার নদী-প্রকৃতির বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটে –যা সমসাময়িক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পট পরিবর্তনের মতোই প্রভাবদায়ী হয়েছিল।

১৭৮৭ সালের এক প্রলয়ঙ্করী রাতে আসামে এক তীব্র ভূমিকম্প সংঘটিত হলে ব্রহ্মপুত্র নদীর গতিপথ পাল্টে যায়। এর ফলে সৃষ্ট বন্যায় সহসা ব্যাপকভাবে প্লাবিত হয় এর আশেপাশের এলাকা। এতদঞ্চলের অশীতিপর দু-একজন বৃদ্ধ বংশ-পরম্পরায় সেই অপসৃয়মান ইতিহাস বহন করছেন। তাদের বর্ণনায় জানা যায়, সেই বন্যায় সারা নদী ভরে যায় বড় বড় ভাসমান গাছপালা আর ধ্বংসলীলায়। ভূমিকম্পের ফলে ব্রহ্মপুত্রের মূল স্রোতধারার গতিপথ পাল্টে কোনাই ও ঝিনাই নদীর দক্ষিণাভিমুখী গতিপথ ধরে তা আরো প্রশস্ত ও অসংখ্য বিনুনাকৃতি হয়ে নবতর যমুনা ধারা সৃষ্টি করে। একপাশে বরেন্দ্র অন্যপাশে ভাওয়াল -এই দুই বৃহৎ প্লায়োস্টোসিন চত্বরের মাঝামাঝি অবনত ভূ-উপত্যকায় দক্ষিণ দিকে যাওয়া এই নদী গোয়ালন্দে পদ্মার সাথে মিলিত হয়।

মূলত এই ভূ-বিপর্যয়ের পর থেকেই গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, জামালপুর, ময়মনসিংহসহ এতদঞ্চলে সোয়া দুইশত বছর যাবত চলছে বন্যা ও নদীর ভাঙ্গা-গড়ার খেলা। এর ফলেই ফি বছর ব্যাপক জান-মালের ক্ষতি হয়। কখনো নদীর বুকে জেগে ওঠে চর, আশা নিয়ে আবার ঘর বাঁধতে ছুটে আসে স্মৃতিকাতর পুরনো ঠিকানার সেই সব জনগণ –যারা এখানে সর্বস্ব খুইয়েছিল। জীবন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আবার একটি জনপদ গাছপালা পশুপক্ষী ফসল ইত্যাদি নিয়ে সজীব হয়ে উঠে। আবার অন্যদিকে শোষক, ক্ষমতাবান, জোতদার, লাঠিয়ালও আসে। সবলদের স্বার্থে শিকস্তি ও পয়স্তির[১০] সুযোগ নিয়ে গরম হয় আদালতপাড়া। কিন্তু বন্যা আর নদীভাঙ্গনের সঙ্গী হিসেবে থাকে চরের মাটি আঁকড়ে থাকা একটি নাছোড়বান্দার দল। ঝম ঝম বর্ষায় চরম উৎকণ্ঠায় কাটে তাদের জীবন- কখন যে বানের তোড়ে ভেসে যায় সব! এবং কখনো কখনো এই আশংকা সত্যে পরিণত হয়। সব হারায় তারা। যারা বেঁচে থাকে তাদের কিনারা হয় দূরের বাঁধে, নয়তো শহর-গঞ্জের ফুটপাথে।

কুন্দেরপাড়ার পুর্নজন্ম কোষ্ঠী

আমাদের আলোচ্য কুন্দেরপাড়া গ্রাম যমুনা-ব্রহ্মপুত্রের বুকে জেগে ওঠা এমনই একটা চর-মাত্র। প্রকৃতির কোন খেয়ালে প্রাগৈতিহাসিক কোন ক্ষণে কুন্দেরপাড়া চর প্রথমবারের মতো জেগে এই নাম ধারণ করেছিল তা স্মরণ আছে এমন কাউকে বর্তমান চরবাসীদের

৯. সূত্র: বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশের ভূগোল, ২০০৬।

১০. প্রাসঙ্গিক তথ্য: ১৮২৫ সালের বঙ্গীয় শিকস্তি ও পয়স্তি (Diluvion and Alluvion) প্রবিধানের মাধ্যমে নদীভাঙ্গন ও ২০ বছরের মধ্যে পুনর্গঠিত চর জেগে ওঠার পর পূর্ববর্তী সত্ত্বের অধিকার দেয়া হয়।

মধ্য থেকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। এ প্রসঙ্গে আলাপ হয় এলাকার সাবেক ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান নুরুন্নবী সরকার-এর সঙ্গে। তার জানান, ১৯৬২ সালের ভূমি রেকর্ডে গাইবান্ধা মহাকুমার পারদিয়ারা মৌজায় কুন্দেরপাড়ার উল্লেখ ছিল। ১৯৬৩-৬৪ সালে চরটি আবার নদীগর্ভে বিলীন হয়। ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত এটা নদীগর্ভে ছিল। ১৯৮৭ সালে (ভূমিকম্প ও যমুনার ধারার দুইশত বছর পর) নতুন করে চরের ভিত্তি হয় কিন্তু তা যথেষ্ট উচ্চতা সম্পন্ন না থাকায় শুধু শুকনো মৌসুমে দৃশ্যমান ছিল। ১৯৮৮ সালে চর আরেকটু জাগে। দখল করার বিপত্তি থাকায় মানুষ পানি সরে যাবার আগেই বাঁশ দিয়ে উঁচু করে ঘর তোলে। প্রথমেই যারা আসে তাদের মধ্যে মাত্র দুইটি পরিবার ছিল বংশগতভাবে কুন্দেরপাড়ার অধিবাসী। বাকীরা আশে পাশের উপজেলা এবং সিরাজগঞ্জ, জামালপুর ও ময়মনসিংহের উদ্বাস্তু। এই চর অধিবাসীরা এখানে আশ্রয় নেবার পর বালাশিঘাট বা অন্য কোন সমতল জনপদ থেকে সরকারি-বেসরকারি ত্রাণ সংগ্রহ করতো।

নুরুন্নবী সরকার স্মৃতি থেকেই বলছিলেন, কারণ ঐ সময়ে তিনি ছিলেন কামারজানি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। তাঁর সাথে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তের সম্পূরক ঘটাচ্ছিলেন ছকমল হোসেন, যিনি ছিলেন ঐ সময়ে ইউপি মেম্বার। কুন্দেরপাড়ার প্রবীণ মুরব্বী আব্দুল মজিদ আকন্দ এবং স্থানীয় হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মোঃ আসাদুজ্জামানসহ আরো অনেকেই ছিলেন সেখানে। এসব পরিস্থিতির চাক্ষুষ স্বাক্ষী এরা সবাই। তথ্য দেবার ফাঁকে ফাঁকে সকলেই যেন এই ছোট্ট দ্বীপের অদূরে বিনম্র-শায়িত বয়েসী যমুনার সেই ভয়াল বন্যার যৌবন-তাণ্ডবের স্মৃতি-বিস্মৃতিতে অবগাহন করছিলেন।

বন্যায় বসতভিটা হারানোর পর শেষ সম্বলটুকু নিয়ে আশ্রয়ের সন্ধানে বানভাসি মানুষ

অধ্যায়-২

আশা-নিরাশার জনপদ

কুন্দেরপাড়া পরিচিতি

গাইবান্ধা জেলা শহর সীমান্ত থেকে ১৬ কিলোমিটার পূর্বে যমুনা-ব্রহ্মপুত্র মিথুনে সৃষ্টি বিনুনাকৃতি নদীর অসংখ্য চরাঞ্চলের একটি কুন্দেরপাড়া। কুন্দেরপাড়া গ্রাম গাইবান্ধা কামারজানি ইউনিয়নের অর্ন্তগত। গাইবান্ধা সদর থেকে যোগাযোগের উপায় কিছুটা সড়ক পথে গিয়ে তারপর নদীপথের নৌকা। কুন্দেরপাড়া আসলে একটি দ্বীপ যার ষোল-আনা চৌহদ্দিই যমুনা-ব্রহ্মপুত্র নদীবেষ্টিত। কুন্দেরপাড়ার পূর্বে মোল্লারচর ইউনিয়ন, দক্ষিণে ফুলছড়ি উপজেলার এরেন্ডাবাড়ী ও ফজলুপুর ইউনিয়ন, পশ্চিমে গাইবান্ধা সদরের গিদারী ইউনিয়ন এবং উত্তরে সুন্দরগঞ্জ উপজেলার কাপাসিয়া ইউনিয়ন।

মূল চরের আয়তন প্রায় দেড় বর্গ কিলোমিটার, দৈর্ঘ্য প্রায় ১৫০০ মিটার, প্রস্থ প্রায় ১০০০ মিটার। ফি বর্ষার পলিসিঞ্চন ও নদীভাঙ্গনের তারতম্যের উপর এই সীমার কিছুটা পরিবর্তন ঘটে। বর্ষাকালে বড় নৌকা ছাড়া গ্রাম থেকে বের হওয়া নিরাপদ নয়। শুষ্ক মৌসুমের কয়েক মাস এর পার্শ্ববর্তী গ্রাম পূর্ব বাটিকামারী ও পারদিয়ারায় ছোট নৌকায় যাতায়াত করা যায়, শুকনো কোন রাস্তা থাকে না। পূর্ব বাটিকামারীতে সীমানা হিসেবে কুন্দেরপাড়ার মোটামুটি তিন দিক (পশ্চিম, উত্তর ও উত্তরপূর্ব)। এর বাইরে পূর্বদিকে পারদিয়ারা, দক্ষিণ ও দক্ষিণে খারজানী, দক্ষিণ-পশ্চিমে ফুলছড়ি উপজেলার কঞ্চিপাড়া গ্রামের সীমান্ত। চরের পশ্চিম পার্শ্বে উত্তর-দক্ষিণ বরাবর প্রতিবছরই কমবেশী যমুনা-ব্রহ্মপুত্রের ভাঙ্গনের শিকার হয়। কুন্দেরপাড়ার পার্শ্ববর্তী নদী-পরবর্তী অন্যান্য গ্রামগুলো হচ্ছে পাড়দিয়ারা, হাঁসধরা, রহমতপুর, পূর্ববাটিকামারী ও পশ্চিম বাটিকামারী।

কুন্দেরপাড়া চরে বর্তমানে মোট ৩১৪ পরিবার বাস করে। জনসংখ্যা ১২৯৪ জন।[১১] আয়তন অনুসারে এর ঘনত্ব বর্গকিলোমিটার প্রতি ৮৬৩ জন যেখানে গাইবান্ধা জেলার জনসংখ্যার ঘনত্ব বর্গকিলোমিটার প্রতি ৯৮১ জন।[১২] এর মধ্যে নারী ৬৪০, পুরুষ ৬৫৪ এবং মেয়ে শিশু ১৬৯ ও ছেলে শিশু ১৩৯। আবাদী জমির পরিমাণ ৩০০ বিঘা, অনাবাদী

১১. জিআরআর প্রকল্প প্রতিবেদন, জিইউকে, ২০০৯

জমি ১০১ বিঘা। নতুন এই চরে জনবসতির আধিক্য অবশ্য বেশী। নুরুন্নবী সরকার-এর দেয়া তথ্য মতে ১৯৯২ সালে এই কুন্দেরপাড়ার ভোটার ছিল ৫১৪ জন, আর এখন এই ভোটার হচ্ছে প্রায় নয় শত।

বর্তমানে কুন্দেরপাড়ায় একটি উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ছাত্র ও ছাত্রীনিবাস, অনেকগুলো টিনের তাবু সম্বলিত উঁচু ও প্রশস্ত বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র, একটি মসজিদ ও ছোট একটি বাজার, ইঞ্জিনচালিত নৌকা, স্পীড বোট, জরুরী মজুদাগার ও কবরস্থান আছে। অধিবাসীদের সম্পদের মধ্যে রয়েছে গরু ৪৮৮টি, ছাগল ১৭৪টি, হাঁস ২০৫টি, মুরগী ৪৭০টি, নলকূপ ২৬৪টি, ল্যাট্রিন ২৬৪টি, উঁচু করা বসতভিটা ২৮১টি এবং নিচু বসতভিটা ৩১টি।[১৩]

এই চরে বিভিন্ন পেশার মানুষ বাস করে। এদের মধ্যে দিনমজুর, মৎস্যজীবী ও কৃষিজীবীর সংখ্যাই বেশী। প্রধান ফসল পাট, কাউন, চিনা, ধান, ভুট্টা, মরিচ, গম, তিসি শাক-সবজি আর মিষ্টি আলু। তবে চরের অধিকাংশ বাসিন্দাই ভূমিহীন এবং বসবাসরত পরিবারগুলোর মধ্যে শতকরা ৮৫ ভাগই অতিদরিদ্র এবং দরিদ্র।

চরগুলোর চারপাশে নদীবেষ্টিত থাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সহজ নয়। কুন্দেরপাড়ার সাথে মূলভূমির যোগাযোগ নৌকা –যা অনিয়মিতভাবে চলাচল করে। আধুনিকতার ছোঁয়া হিসেবে সেল ফোন খুবই কার্যকরী হচ্ছে। চরে এখন পর্যন্ত বিদ্যুতায়ন হয়নি। ফলে যান্ত্রিক সমৃদ্ধি ঘটেনি। জ্বালানী তেল ব্যবহার উপযোগী ট্রাক্টর, পাওয়ারটিলার, সেচযন্ত্র নৌকায় ব্যবহৃত ইঞ্জিন ছাড়া যন্ত্রের ব্যবহার নেই বললেই চলে। কুন্দেরপাড়া গণ উন্নয়ন একাডেমির সৌরবিদ্যুৎ চরের নতুন সংযোজন –যা বিদ্যালয় ও ছাত্র-ছাত্রী নিবাসসহ চরের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোকে আলোকিত করছে।

চরের জনজীবন- দুর্যোগের সাথে বসবাস

১৯৮৮ সালে কুন্দেরপাড়ার পুর্নজন্ম হলেও এর বর্তমান আদল পেতে সময় লেগেছে আরো কতক বছর। ১৯৯১ সালের বন্যায় চরটি আরেকটু বড় হয়। এবছর আরো ২০-৩০ টি পরিবার কুন্দেরপাড়ায় বসত গড়ে। বিভিন্ন জেলা থেকে ভূমিহীন উদ্বাস্তু জনগণ জড়ো হতে থাকে। স্থানীয়ভাবে এরা 'চরুয়া' (চরের অধিবাসী) হিসেবেই পরিচিত। এরা এসে নতুন বালুচরে ঘর বাঁধার জন্য তদবিরের কাঠখর পুড়াতে শুরু করে। তবে চরাঞ্চলের জন-জীবন কখনো নিরুদ্বেগ বা নিষ্কন্টক ছিল না। কোন না কোন বাধা সর্বদাই তাদের নিয়তিকে তাড়া করে ফিরে যেন। ১৯৯৪ সালে বন্যা কম হলেও ব্যাপক ঝড়ে চরের সবকিছু বিধ্বস্ত হয়। ১৯৯৫ সালে পুনরায় বিপদ হানা দেয় কুন্দেরপাড়া চরে।

১২ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, গাইবান্ধা জেলা, ২০০১

১৩ জিইউকে আঞ্চলিক কার্যালয়ে সংরক্ষিত তথ্য থেকে গৃহিত

সেই বন্যায় পুরো গ্রাম বন্যার পানিতে তলিয়ে যায়। অবর্ণনীয় সেই দুঃসহ স্মৃতি আজও অনেকে ভুলতে পারে নি। গ্রামবাসী মজিদসহ অনেকে সেই দুঃসহ ভয়াল রাতের যে বর্ণনা দেন তার সংক্ষিপ্তরূপ হচ্ছেঃ

১৯৯৫ সালের বন্যায় আগের দিন সন্ধ্যা থেকেই গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি আর আকাশে ঘোলা কালোরঙা মেঘের হঠাৎ আনাগোনা অনেকের মনেই শংকা জাগিয়েছিল। নদীর চলনবলনও কেমন যেন রহস্যপূর্ণ ঠেকছিল তাদের কাছে। রাত বাড়ার সাথে সাথে শুরু হয় প্রচণ্ড ঝড়ের তাণ্ডব। একদিকে ভরা দরিয়ার মাঝখানে টলমলে ছোট চর অন্যদিকে ঝড়ের ঝাপটার দাপটে সকলেরই প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি। আজান, গরুর আর্ত হাম্বা রব, বাসনপত্রের ঝম্-ঝমানি আর বাচ্চাদের আর্ত চিৎকারের সমস্বর নদীর ঘূর্ণিস্রোত আর ঝড়ের গর্জনের কাছে অসহায় হয়ে পড়লেও সবাই জানতো এই রাতে তাদের বাঁচাতে কেউ এগিয়ে আসবে না। ভোর রাতের দিকে ঝড় থিত হয়ে আসলে দেখা গেল চরের প্রায় অর্ধেক ডুবে গিয়েছে। বেলা দশটা নাগাদ দু-একটি নৌকাকে চড়ে ভেড়ানো সম্ভব হলেও তাদের চাহিদা ছিল আকাশচুম্বি। এত অল্প সময়ে যার হাতের সামনে যা ছিল তাই নিয়ে নৌকায় উঠার চেষ্টা চললো। যার দুটো গরু ছিল একটা নৌকাওয়ালাকে দেবার শর্তে পার করাতে রাজী করানো গেল। এভাবে পর পর কয়েকবারে অন্তত চরের জনগণকে জীবন্ত উদ্ধার করা সম্ভব হলেও মালামাল উদ্ধার মোটেও সম্ভব হয়নি। মজিদ আকন্দ আরও পাঁচজন নিয়ে শেষ বারের মতো নৌকাযোগে চর ত্যাগ করে কয়েকটা ঘূর্ণিস্রোত পেরিয়ে কোনমতে যখন পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাঁধে (সাবেক ওয়াপদা) উঠে তার পরপরই কুন্দেরপাড়া আবার নদীগর্ভে তলিয়ে যায়।

বন্যায় চরের জনবসতির ব্যাপক ক্ষতি হয়, পরিবারগুলো সর্বস্ব হারায়। অবশ্য চরের কাঁশবনে আবার পলি জমে চরটি কোনরকমে তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে। এরপর আবার ১৯৯৬ ও ১৯৯৮ সালের বড় বন্যায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

বর্ষা শেষে চরের অধিবাসীরা বাঁধ বা অস্থায়ী আশ্রয় থেকে আবার ফিরে আসে। যাদের ঘর জমি পুরোটাই নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায় তাদের অনেকেই আর ফিরে আসার জায়গা পায় না। ভূমিহীন হয়ে তারা অন্যত্র উদ্বাস্তু হয়। যারা জায়গা পায় তারা আবার ঘর বাঁধে, গাছ লাগায়। দুঃখময় এই সব জীবনের সব অধ্যায় যাদের একইরকম তাদের কাছে বন্যা-নদীভাঙ্গন দুর্যোগ আর এমন কি! এর বাইরেও চরের হতদরিদ্র অধিকার বঞ্চিত মানুষ শৈত্যপ্রবাহ, খরা, টর্নেডো ও মঙ্গার সঙ্গে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকে। এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগই তাদের জীবন-মান উন্নয়নের অন্যতম অন্তরায়।

বাঁচার উপায়ের খোঁজে

নদী, জল, ঝড়, শীত, খরা, ব্যাধি, নিরাপত্তাহীনতাকে নিত্য সঙ্গী করে কুন্দেরপাড়ার জনগণ তাদের জীবন সংগ্রামের নবতর অধ্যায় শুরু করে। নতুন চরে সমস্যার অন্ত ছিল না। কোন প্রতিষ্ঠান বা বাজারের চিহ্নমাত্র ছিল না। মূলভূমির সাথে যোগাযোগের মাধ্যম একমাত্র নৌকা-যা এখন পর্যন্ত বিদ্যমান। ১৯৯২ সালের শেষের দিকে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে

একটি টিউবওয়েল মঞ্জুর হয়। ১৯৯৩ সালে খর ও বাঁশ দিয়ে একটি ছাপড়ার মসজিদ এলাকাসী নিজের চেষ্টায় তৈরী করে। পাশের পারদিয়ারা গ্রামে একটি রেজিষ্ট্রি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল (কেবলাগঞ্জ রেজিস্ট্রি প্রাথমিক বিদ্যালয়), এলাকার জনগণের উৎসাহে ১৯৯৪ সালে স্কুলটি কুন্দেরপাড়ায় স্থানান্তরিত হয় (কারণ পারদিয়ারায় আরেকটি স্কুল ছিল)। উক্ত সময়ে আর কোন অবকাঠামো ছিল না। এলাকার জনগণের নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহের জন্য কামারজানিহাট, সানন্দবাড়ী বাজার ও গাইবান্ধা শহর গমন ছাড়া কোন উপায়ান্তর ছিল না।

চরের জনগণ প্রচণ্ড পরিশ্রমী। এখানকার সক্ষম নারী-পুরুষদের সাথে তাদের সন্তান কিশোর-কিশোরীরাও প্রাত্যাহিক আয়-মূলক কাজে পিতা-মাতাকে নিয়মিতভাবে সাহায্য করে থাকে। দারিদ্র্য তাদের নিত্য সঙ্গী হলেও মানসিকতা মধ্যম মানের। তারা সাধারণত খুব বড় স্বপ্ন দেখে না, অন্যদিকে ভিক্ষাবৃত্তিকেও মনেপ্রাণে ঘৃণা করে। তারা মনে করে ভিক্ষা করে দুই বেলা খাওয়ার চেয়ে কষ্ট করে এক বেলা খাওয়া বেশি সম্মানজনক। বাঁচার পথ মহিলা সমিতির হাছিনা খাতুন কিংবা স্নিগ্ধা মহিলা সমিতির মমতা বানু এরা সকলেই পরিশ্রম করে জীবন বাঁচাতে চান।

১৯৯৫ সালের ঝড় ও বন্যায় কুন্দেরপাড়ার ঘর, গাছপালা ও ফসলসহ প্রায় সবকিছু বিধ্বস্ত হলে সংবাদ পেয়ে গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের কর্মীরা আসে এবং জরুরী ত্রাণ সহায়তা দেয়। এসময়ে ২২৫টি পরিবারের মধ্যে ২ কেজি চিড়া ও আধা কেজি গুড়সহ অন্যান্য সামগ্রী বিতরণ করে। এমতবস্থায় কেউ কেউ স্থায়ীভাবে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি থেকে বাঁচার উপায় খুঁজে। জিইউকের কর্মীরা এখানকার অসহায় মানুষের শোচনীয় জীবনযাত্রা খুব কাছ থেকে উপলব্ধি করে। গণ উন্নয়ন কেন্দ্র পরবর্তীতে কুন্দেরপাড়াকে সংশ্লিষ্ট কর্মসূচির আওতায় বিবেচনায় রাখে এবং এবছরই (১৯৯৫) বন্যার পর একটি বেইজলাইন সার্ভে করে।

কলাগাছের ভেলায় বৃদ্ধা ও যুবতী: বন্যায় জিইউকের মাধ্যমে দেয়া ত্রাণ সংগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছে

অধ্যায়-৩

গণ উন্নয়ন কেন্দ্রঃ বিপন্ন মানুষের পাশে

গ্রামবাসীর আগের অবস্থার চিত্র

বাংলার গীতিকবিতায় নতুন চরে ঘর বাঁধার আশা নিয়ে সুর বা গান শ্রুতিমধুর হলেও বাস্তবে তা বেদনা-বন্ধুরতায় কন্টকাকীর্ণ। তারপরেও চরের জনগণ গহীন বালুচরে ঘর তোলে, কারণ নদীবর্তী এই ভাঙনের শিকার জনগোষ্ঠী উদ্বাস্তু হয়ে ঘুরে ফেরার চেয়ে কোথাও স্থিত হয়ে শ্রম আর ঘাম দিয়ে পেটের ভাত যোগাতে চায়। প্রথম অবস্থায় জনশূণ্য মরিচীকাময় বালুচরে ছিল শুধু কাঁশবন, হুগলা আর ছন –যা চরের আপন-জন্মা উদ্ভিদ। চরের এই ছন দিয়েই তারা কুঁড়েঘরের বসতি গড়ে তোলে, চলে কুঁড়েঘর ছাউনীর কাজ। ধীরে ধীরে শস্যহীনতা কাটাতে কারো কারো ঘরের চালে বাড়ন্ত লাউ-সিম লকলক করে বেড়ে ওঠে। অনেকেই কলা বা রেড়ি রোপন করে। বাঁশ সংগ্রহ করে শ্রম বা টাকার বিনিময়ে।

কুন্দেরপাড়ার চরে প্রথম বসতির অভিজ্ঞতা নিয়ে এভাবেই বলছিলেন গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের বিভিন্ন সমিতির সদস্য সোনাভান, গুজরতি বেগম আর সুরতবানু। তারা আরো জানায়, নতুন চরবাসীর সামনে উপার্জনমূলক কোন কাজ না থাকায় প্রথমদিকে ঘন কাঁশবন কেটে আগুনে পাতা পুড়িয়ে কাণ্ডগুলো জ্বালানী খড়ি হিসেবে গাইবান্ধা শহরে বিক্রি করে। এভাবে দিনে ৪০ থেকে ৫০ টাকা আয় করা সম্ভব হতো। সেই আয়ের টাকা দিয়ে কাউন, চিনা, প্যারা, মিষ্টি আলু কিনত। আটার রুটি বা ভাত তাদের কাছে ছিল দুর্মূল্য। আবার এসব খড়ি বিক্রয়ের বড় একটা অংশ শহরে যাতায়াতের নৌকা ভাড়া হিসেবে ব্যয় হয়ে যেত। যেদিন নৌকা পাওয়া যেত না সেদিন পরিবারের সবাইকে অভুক্ত থাকতে হতো। কোনরূপ সঞ্চয় বা মজুদ ছিল না তাদের। বেশি অভাবে তারা বাধ্য হতো মূলভূমির মহাজনদের নিকট থেকে মাসে ১০ থেকে ২০% হারে চড়া সুদে গ্রহণ করে স্থানান্তর গমনে। প্রায় তিন থেকে ছয় মাস তারা বাইরের জেলায় চলে যেত কাজের সন্ধানে, ফিরে এসে সুদে আসলে পরিশোধ করতো ধার দেনা। এই সময়টা পরিবারের সকলের ভরণপোষণের দায়িত্ব থাকে নারীর উপর। তখন পুরুষেরা দিন প্রতি মজুরী ৪০-৫০ টাকা পেলেও নারীরা পেত ১৫-২০ টাকা। তাছাড়া আগাম শ্রম বিক্রি করে চলত তাদের সংসার।

কুন্দেরপাড়ার সচেতন অধিবাসী গণ উন্নয়ন কেন্দ্র সংগঠিত বাঁচার পথ মহিলা সমিতির সভানেত্রী হাছিনা খাতুন তার অভিজ্ঞতা থেকে জানান, চরবাসীর প্রথম ও প্রধান বিপদ

হচ্ছে নদীভাঙন –যা যে কোন সময়ে তাদের পায়ের নিচের মাটি কেড়ে নিয়ে যেতে পারে। উপর্যুপরি প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষ করে বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, শৈত্যপ্রবাহ নদী চরের অসহায় দরিদ্র জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রধান প্রতিবন্ধকতা ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে। বছরের প্রায় সকল সময় নদী ভাঙনের ফলে শত শত পরিবার ভূমিহীন, গৃহহীন ও সহায়-সম্বলহীন বা নিঃস্ব হয়ে পড়ে। বন্যা বাড়িঘর ডুবিয়ে দেয়, ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, গৃহস্থালী জিনিষ, মজুদ শস্য, গবাদি পশুপাখি, গাছপালা, সব্জি ও ফলবাগান ইত্যাদির ক্ষতিসাধন করে। তখন রান্না, নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের সমস্যা হয়। এসব ছাড়াও বন্যা কখনও কখনও পলি মাটি বয়ে এনে জমিতে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে আবার কখনোবা অধিক বালি এনে জমিকে অনাবাদী করে তুলে। বন্যার সময় ঘরের চালে এবং বাঁশের উঁচু মাচায় আশ্রয় নিয়ে তাদের জীবন রক্ষা করতে হয়। কখনও কখনও তপ্ত খরার প্রকোপ জমির ফসলকে নষ্ট করে ফেলে। বন্যায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতির সম্মূখীন হয় নারী, শিশু, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী ও অসুস্থ্য পরিবার। গাইবান্ধার চরাঞ্চল সমতল ভূমি হতে নিচু হওয়ায় অতিবৃষ্টি, পাহাড়ি ঢলসহ অন্য কোন কারণে নদীতে পানি বৃদ্ধি পেলেই প্লাবিত হয়। এর ফলে ফসল উৎপাদন ও কর্মসংস্থান মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শীতের সময় প্রায়ই শৈত্যপ্রবাহ হয়, তখন একদিকে যেমন জনজীবন বিপর্যস্ত হয় অন্যদিকে বেশী কুয়াশায় ফসল নষ্ট হয়। এসব প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা চরের জনগণের নিত্য সহচরী। তবে বন্যা চরের জনগণের জন্য কিছু বিকল্প অবলম্বনও নিয়ে আসে তা হচ্ছে খড়ি সংগ্রহ ও মাছ ধরা। বন্যায় নদীভাঙনের ফলে বিভিন্ন গাছপালা, নল-খাগড়া নদীতে ভেসে আসে। নৌকা বা সাঁতড়ে এসব সংগ্রহ করে খড়ি হিসেবে বিক্রি করে। তাছাড়া মাছ ধরা এ সময়ের নিত্যকার চিত্র –যা তাদের খাদ্য হিসেবে ও অর্থ উপার্জনে সহায়তা করে। বন্যায় আরেক বড় সমস্যা ছিল নৌকার অভাব –যা দরিদ্ররা করুণভাবে অনুভব করে আসছে দীর্ঘকাল কোন উদ্ধার সহযোগিতা না পেয়ে।

মুক্তারমালা সমিতির সভানেত্রী শাহিদা আক্তার জানান, ১৯৯৫-৯৬ সালে যখন জিইউকে ত্রাণ দিত তখন কুন্দেরপাড়ার সবাই সবাই টিপসই দিয়ে তা গ্রহণ করতো, কেউ স্বাক্ষর জানতো না। শুধু কুন্দেরপাড়া নয়, আশপাশের তিনটি গ্রামে স্কুলে পড়ে এরকম একজনও মেয়ে ছিল না। ছেলে দু একজন পাওয়া যেত ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত শিক্ষিত।

কুদরত আলী প্রামানিক (শিক্ষক, কুন্দেরপাড়া গণ উন্নয়ন একাডেমি) বলেন, কামারজানি ইউনিয়নের এই এলাকায় দুইটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং তিনটি রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। কিন্তু ক্রমাগত নদীভাঙন আর মূলভূমি হতে আসা শিক্ষকদের দিনের পর দিন অনুপস্থিতির কারণে শিক্ষা বিঘ্নিত হয়। বেশিরভাগ সময়েই 'প্রক্সি টিচার' দিয়ে ক্লাস নেয়া হতো। এসকল সমস্যার কারণে প্রাথমিক শিক্ষার আলো থেকে এই অঞ্চলের শিশুরা বঞ্চিত হয়। আর মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই এলাকাতেই ছিলনা। আশির দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত 'দক্ষিণ কামারজানী উচ্চ বিদ্যালয়' ছিল পার্শ্ববর্তী নুনগোলা মৌজায়, কিন্তু স্কুলটি নদীতে বিলীন হলে তারপরে আর পুনঃপ্রতিষ্ঠার জায়গা না পাওয়া যাওয়ায় স্থানান্তরিত হয় গাইবান্ধা শহরতলী পুলবন্দিতে। দীর্ঘ ২০ বছর এ

এলাকায় আর কোন মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেনি। ফলে চরাঞ্চল থেকে হাতে গোনা যে ক'জন শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয় লেখা-পড়া শেষ করতো, তাদের আর মাধ্যমিক শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ হতো না। আর এ কারণেই এখানে বাল্যবিবাহ ও শিশুশ্রমের হার ছিল উদ্বেগজনক।

মারী-মড়ক রোগ-শোক লেগেই থাকতো চরে। চিকিৎসার সামর্থ ও সুযোগ কোনটিই ছিল না চরবাসীর নাগালে। বন্যাকালিন জ্বর, ডায়রিয়া, বন্যা পরবর্তী কলেরা, আমাশয়, টাইফয়েড, এছাড়া জন্ডিস, খোসপাচড়া, চুলকানি নিউমোনিয়া, হাঁপানী, গুটিবসন্ত ইত্যাদি লেগেই থাকতো। প্রসূতি মাতার জন্য চর ছিল অনিরাপদ আবাস। স্থানীয় ধাত্রীর মাধ্যমে অনিরাপদ ও ঝুঁকির মধ্য দিয়ে বাচ্চা প্রসব করানো হত। সু-চিকিৎসা না থাকায় গর্ভবতী ও প্রসবকালিন মৃত্যুর ঘটনা প্রায়ই ঘটতো। চরের জনগণ ভুল ও অপচিকিৎসার ফাঁদ যেমন, তুক-তাক, ঝাড়-ফুক, জ্বিন-ভুতের আছর ছাড়ানো, ইত্যাদি গ্রাম্য চিকিৎসার উপর নির্ভরশীল ছিল। এসব কারণে প্রায়ই জীবনহানিসহ মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হতো। চরের নিরাপদ পানীয় জল ও পয়ঃনিষ্কাষণের ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত নাজুক। শুরুতে মাত্র দুটি টিউবওয়েল সারা চরের চাহিদা মেটাতে পারতো না। পানির উৎস ছিল নদী। ১৯৯৬ সালের আগে চরে ল্যাট্রিন বলতে ছিল না।[১৪] মহিলারা রাতে বা খুব ভোরে বাড়ির অদূরে কোনরকম আবরণ তৈরী করে, শিশুরা খোলা স্থানে আর পুরুষেরা নদীর ধারে বা কাঁশবনে প্রাকৃতিক ক্রিয়াদি সম্পন্ন করতো।

চরে নারীর অধিকার ও মর্যাদা মারাত্মকভাবে ভূলুণ্ঠিত। নারীর প্রতি অমানবিক শারীরিক মানসিক নির্যাতন ছাড়াও তালাক, হিল্লা-বিবাহ, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, যৌতুক, ফতোয়া ও অন্যান্য গোঁড়ামী মারাত্মক সামাজিক অস্ত্র হিসেবে চড়াও হয়ে নারীদের অধিকার বিনষ্ট করতো। সামান্য কারণে তাদের উপর নির্যাতনের খড়গ নেমে আসতো। এসব নারীরা ছিল পরিবারিক বা সামাজিক সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় বাইরে। বাড়ির বাইরে কাজ করতে যাওয়া ও শিক্ষার ক্ষেত্রে ছিল নিষেধাজ্ঞা। বেড়ানো বিনোদন-তো দূরের কথা, মঙ্গা ও বন্যার সময়ে পুরুষ সদস্যরা কাজের সন্ধানে স্থানান্তর গমন করলে সন্তানাদি নিয়ে অনেক কষ্টে খেয়ে না খেয়ে দিনাতিপাত করে। নারীরা কখনো সম্পদের মালিক হতো না বা কাজ করলেও স্বীকৃতি পেতো না। প্রথমদিকে কুন্দেরপাড়ার নারীদের সাথে যোগাযোগ করাটা ছিল অনেক কঠিন ব্যাপার। পুরুষ কর্মীদের সামনেই তারা আসতো না, নারী কর্মীদেরও এড়িয়ে যেতো।

চরের জনগণের বিপদাপন্নতার সুযোগে একের বিরুদ্ধে অন্যকে ব্যবহার করে দুষ্ট লোকের ফায়দা লুটার প্রবণতা ছিল প্রচণ্ডভাবে লক্ষণীয়। অধিবাসীদের মধ্যে ঐক্য না থাকায় ঝগড়া, কলহ, জবরদখল, হানাহানি, অরাজকতা ইত্যাদি সামাজিক ও পারিবারিক শান্তি বিনষ্ট করতো এবং জীবনহানি ঘটাতো। কাজ দেবার নাম করে নারী ও শিশু পাচার বা বিক্রি করে দেবার উদাহরণও রয়েছে। বন্যা ও অন্যান্য দুর্যোগে যার যার চিন্তা নিয়ে

১৪. ICDP বেজলাইন সার্ভে, জিইউকে, ১৯৯৬

ব্যস্ত থাকায় সমন্বিত উদ্যোগ কখনো নেয়া হয়নি এবং তার ফলও কেউ পায়নি। এভাবেই বন্যা ও নদীভাঙ্গন কবলিত জনগণ কখনোই সংঘশক্তিকে ইতিবাচক কাজে লাগায়নি বা সামষ্টিক সম্পদের মালিক হয়নি।

কুন্দেরপাড়া গণ উন্নয়ন একাডেমির প্রধান শিক্ষক জনাব আসাদুজ্জামান এর দৃষ্টিতে, জীবনের বেশীরভাগ সময়ে আতঙ্ক, আশ্রয়হীনতা ও স্থায়িত্বশীলতা না থাকার কারণে শিক্ষা, দক্ষতা, সচেতনতা, স্বাস্থ্য, আয়-উন্নতি সকল দিক থেকে পিছিয়ে থাকে চর এলাকার জনগণ। যখন তখন নদীভাঙ্গনের সম্ভাবনা থাকায় ইতোপূর্বে কোন উন্নয়ন সংগঠন তাদের সদস্য করেনি। এতসব সমস্যা সমাধানকল্পে যে কোন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ সত্যিকারেই অত্যন্ত দুরূহ। এজন্য দীর্ঘকাল চরবাসীকে ভোগ করতে হয়েছে অবর্ণনীয় দুঃখভোগ, হতাশা আর বঞ্চণা।

উন্নয়ন ও পরিবর্তনের লক্ষ্যে জিইউকে

যমুনা-ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা ও ঘাঘট বিধৌত গাইবান্ধা জেলা বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের অন্যতম দুর্যোগ ও দারিদ্র্য পীড়িত জেলা। বাংলাদেশের স্থানীয়ভিত্তিক ধারাবাহিক উন্নয়ন প্রচেষ্টা ও নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন-কে মূল করণীয় হিসেবে স্থির করে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (জিইউকে) দেশের উত্তরাঞ্চল বিশেষ করে গাইবান্ধা জেলায় বিগত দুই যুগের অধিককাল ব্যাপী দরিদ্র ও হতদরিদ্রদের উন্নয়নে কর্মরত। বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন সংগঠন হিসেবে ১৯৮৪ সালে আত্মপ্রকাশের পর ১৯৮৬ সাল থেকে একই লক্ষ্যে জিইউকে 'সমন্বিত গ্রাম উন্নয়ন কার্যক্রম' বাস্তবায়ন করতে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে আসে। একপর্যায়ে এই কর্মসূচির আওতাভুক্ত হয় এতদঞ্চলের দুর্যোগপ্রবণ ও অধিক বিপন্ন জনপদ তথা যমুনা-ব্রহ্মপুত্রের বুকে জেগে উঠা চরাঞ্চলে। স্বাধীনতা পরবর্তী উত্তরবঙ্গে বিশেষ করে গাইবান্ধা জেলায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন উদ্যোগ গৃহীত হলেও প্রথম একমাত্র জিইউকে চরের জনবসতির ধারাবাহিক ও টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯১ সাল থেকে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সম্পৃক্ত হয় আন্তর্জাতিক বেসরকারি উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান অক্সফাম-গ্রেট ব্রিটেন-এর সাথে।

জিইউকে'র সাথে প্রাথমিকভাবে বন্যা কবলিত জনপদের মধ্যে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচিতে সহায়তার মাধ্যমে অংশীদারিত্বের সূচনা হলেও পরবর্তীতে যমুনা-ব্রহ্মপুত্র নদী প্রণালীর গাইবান্ধা অঞ্চলের বন্যা দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি প্রশমন, দারিদ্র্য বিমোচন ও নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে চরাঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনমান উন্নয়ন এবং অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ জিইউকের বিভিন্ন কর্মসূচিতে অক্সফাম-জিবির সহযোগিতা সম্প্রসারিত হয়। ১৯৯১ থেকে ১৯৯৭ এই দীর্ঘ সময় চরাঞ্চলের বন্যাজনিত ক্ষয়ক্ষতি ও জনবসতির উপর তার প্রভাব তথা দুর্দশা জিইউকের সাথে অক্সফাম-জিবি'র প্রতিনিধিরা খুব কাছ থেকে কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করে।

১৯৯৫ সালের ভয়াবহ বন্যার পর গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (জিইউকে) এবং দাতা সংস্থা

অক্সফাম-জিবি'র যৌথ প্রচেষ্টায় চরাঞ্চলের ভাগ্যহত জনগণের সার্বিক উন্নয়নে সহায়তা দেওয়ার বিষয়টি প্রাধান্য পায়। ১৯৯৫ সালে বন্যার পর কুন্দেরপাড়ায় দুর্যোগ-এর ক্ষয়ক্ষতি নিরূপনের লক্ষ্যে বেজলাইন সার্ভে আয়োজন দিয়ে জিইউকের ধারাবাহিক কার্যক্রমের শুরু। একই সাথে গ্রামবাসীদের নিয়ে বিভিন্ন প্রাকৃতিক-দুর্যোগ ও দারিদ্র্য সংশ্লিষ্ট সমস্যার স্থায়ী সমাধানের ব্যাপারে প্রকল্প গ্রহণে উদ্যোগী হয় জিইউকে। এসব উদোগের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কুন্দেরপাড়া বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মান।

জিইউকে'র প্রধান নির্বাহী এম. আব্দুস সালাম-এর নিকট সংরক্ষিত বিভিন্ন আলোকচিত্র, টুকরো প্রতিবেদন এবং তার স্মৃতি থেকে সেই সময়ের চরের সাথে যোগাযোগ স্থাপন বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায় যে, কাজটা কোনভাবেই সহজসাধ্য ছিল না। তিনিসহ জিইউকের কর্মীরা লাগাতার বৃষ্টি, কাঁদা ও পানির মধ্যে দীর্ঘপথ হেঁটে বা নৌকায় সেখানকার মানুষের কাছে পৌঁছুতেন। চরের মানুষের চরম দুর্দিনে তাদের তাৎক্ষণিক চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি তাদের জীবন-যাত্রা, সমস্যা, প্রত্যাশা ইত্যাদির উপর প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও চাহিদা নিরূপনের মাধ্যমে এবং এসব সমস্যার সম্ভাব্য সমাধানের ব্যাপারে সচেষ্ট থাকেন। তবে জিইউকে'র কর্মীরাই শুধুই একা ছিলেন না, তাদের সহায়তা ও সাহস যোগাতে এগিয়ে এসেছিল অক্সফাম-জিবি। বিশেষ করে অক্সফাম-জিবি'র সেই সময়ের কর্মকর্তা গওহর নঈম ওয়ারা এবং এনামুল হক চরবাসীদের এসকল সমস্যার স্থায়িত্বশীল সমাধান পথ খোঁজার জন্য অনেক ক্লেশ শিকার করেছেন। জিইউকের কর্মীদের সাথে তারা পথের দুর্গমতার ঝুঁকি বহন করে অনেকবার বিভিন্ন চরে গমন করেন।

১৯৯৬ সালের বন্যায় এলাকায় জরুরীভাবে বন্যা ও নদীভাঙ্গন মোকাবেলায় উদ্ধার, ত্রাণ ও পুনর্বাসনের পাশপাশি দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি প্রশমনের কার্যক্রম আরো নিবিড় হয়। এসব কার্যক্রমের মধ্যে থেকে শিক্ষণীয় বিষয়কে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে তার আলোকে অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনার ভিত্তিতে ১ মে ১৯৯৭ সাল থেকে গৃহীত হয় তিন বছর মেয়াদী 'সমন্বিত দুর্যোগ প্রস্তুতি ও চর উন্নয়ন কর্মসূচি (ICDP)' –যাতে অনুপ্রেরণা, আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা প্রদান করে অক্সফাম-জিবি। মেনোনাইট সেন্ট্রাল কমিটি (এমসিসি) এবং ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতাল (ডিসিএইচ) যথাক্রমে কৃষি ও স্বাস্থ্য বিষয়ে উক্ত প্রকল্পে সম্পূরক কারিগরী সহায়তা প্রদান করেছে।

আইসিডিপির পর (মে ২০০০- এপ্রিল ২০০৮) বিভিন্ন ধাপে 'রিভার বেসিন প্রোগ্রাম (আরবিপি)' প্রকল্প বাস্তবায়ন করে দুর্যোগ-ঝুঁকি প্রশমনসহ চরের অবকাঠামো উন্নয়ন এবং চরবাসীর জীবনমান উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হয় গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (জিইউকে)। এছাড়া সম্প্রতি সমার্থক উদ্দেশ্যে এখানে একই দাতা সংস্থার সহায়তায় 'ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন এন্ড ভার্নারেবল লাইভলিহুড (DRR&VLH)' প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়ে আসছে।

অধ্যায়-৪

দুঃখ মোচন

বন্যা ও নদীভাঙ্গন : কুন্দেরপাড়ার প্রধান দুঃখ

প্রাকৃতিক দুর্যোগই চরের প্রধান সমস্যা। এসব দুর্যোগের মধ্যে বন্যা, নদীভাঙ্গন, খরা, ঘূর্ণিঝড়, শৈত্যপ্রবাহ থাকলেও বন্যা আর নদীভাঙ্গন সবচেয়ে বিধ্বংসী আর সর্বগ্রাসী। এর মাধ্যমেই সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফজলুপুর চরের বানভাসি মেয়ে পিঞ্জিরা (৫০) বর্তমানে বাস করে কুন্দেরপাড়ায়। এ পর্যন্ত নয় বার বন্যা তার ক্ষতি করে।

কুন্দেরপাড়া গ্রামের এই মেয়ে এর আগে কখনো সুখের মুখ দেখেনি। বাবা-মায়ের অন্যতম চিন্তা ছিল যৌতুক ছাড়া কিভাবে এই মেয়ের বিয়ে দেবে। সোমত্ত বয়সেও উপযুক্ত পাত্র না পাওয়ায় শেষ পর্যন্ত বিয়ে হয় দুই সন্তানের জনক ও প্রথম স্ত্রী বিদ্যমান এমন একজন বয়স্ক আবু তালেবের সাথে। স্বামীগৃহ মোটেই সুখের ছিল না, দুই সন্তান কোলে নিয়েও অসহনীয় অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করতে হতো। তার বিকৃত কান এখনো সেই নির্যাতনের চিহ্ন বয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু জলে কুমির ডাঙ্গায় বাঘের মতো তার সেই বেসামাল সংসারে দ্বিতীয় বিপদ দেখা দিত বন্যা।

পিঞ্জিরা বেগম ১৯৮৮ সালের বন্যার যে ভয়াল রূপ দেখেছেন তা বর্ণনা করতেও গায়ে কাঁটা লাগে। তখন সে ফজলুপুর চরে বাস করতো। অকস্মাৎ বন্যায় অপ্রস্তুত পিঞ্জিরা তার সতীন, ছেলে, ছেলের বউ এবং তার ছোট সন্তানসহ পুরো অভুক্ত থেকেছেন তিনদিন!

"... একদিকত প্যাটের ভোগে জিউ চলি যায় আর একদিকত দড়িয়ার চরে হামার গলা পানি। দড়িয়ার ভয়াল ধারত হামরা সগাই মিলি জড়াজড়ি করি কোনও মতে টিকি আছি। ঠিক তখনে হামার ঐ পাক দিয়া এখান ছ্যালোর নাও যাবার ধরছিল। আর ঐ নাও দেখিয়া সগাই মিলি কাউলাকাউলি কইল্লে তখন নাওটা হামার কাছত আসিয়া হামার ঘরক তুলি নিয়া জেবনটা বাঁচায়। নাও থাকি হামরা দেখি হামার খেরি ঘড়টা দরিয়াত ভাসি যাবান নাইকছে। কষ্টে হামার চোকের পানি চোকে শুকি গ্যালো। খানিক ফাকত যায়া দেকি এ্যাখান খাড়ের পালা ভাসি যাবার নাইকছে। তারে উপরত এখান পোয়াতি মরা ছইল কোলত নিয়া বসি আছে; তার সতে সোয়ামী আরও দুইটা ছইল।

মরা ছইলটা মাটি দ্যাওয়ার জন্য হামার ঘরেক খুবই পিড়াপিড়ি কইর্লে নাওটা হামার ঘরেক নিয়া বালাসী ঘাটের দিকে আইল..."

[...একদিকে ক্ষুধায় জীবন আর বাঁচে না অন্যদিকে চরে তখন আমার গলা পানি। প্রচণ্ড স্রোতে একে অপরকে ধরে কোন রকমে টিকে আছি। ঠিক সেই মুহূর্তে একটা শ্যালোচালিত নৌকা দূর দিয়ে যাবার কালে আমাদের অনেক ডাকাডাকিতে তবে এসে উদ্ধার করে। আমরা নৌকায় বসে দেখতে পেলাম আমাদের কুড়ে ঘরটি ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কষ্টে আমার চোখের পানি চোখেই শুকিয়ে গেল। কিছু দূর যাবার পর দেখতে পেলাম একটি ভাসমান ঘরের চালা, তার উপর একটি সদ্য প্রসূতি মা একটি মৃত আর দুজন জীবন্ত শিশুসন্তান ও স্বামী। বাচ্চাটাকে দাফন করার জন্য আমাদের কাছে কাতর আবেদন জানালো তারা, তারপর নৌকাটি তাদের উদ্ধার করলো এবং বালাসি ঘাটে নিয়ে গেল।...]

বন্যার পরে চরম অভাব আর হাহাকারের শিকার পিঞ্জিরার উপর নির্যাতন আর সহিংসতা চরম আকার ধারণ করলে সে দুই সন্তান নিয়ে বগুড়া চলে যায়। তিন মাস একটি চাতালে কাজ করে তিন হাজার টাকা ও ২০ কেজি চাল নিয়ে আবার সে ফজলুপুর এসে ঘর তোলে। কিন্তু দু বছর পর আবার বন্যা তার সব কিছু গ্রাস করে নেয়। এসময় সে জানতে পারে যে, নতুন চর কুন্দেরপাড়ায় অনেক খাস জমির বণ্টন হচ্ছে। তখন সে কুন্দেরপাড়া চরে চলে আসে। এখানে মাথা গোঁজার ঠাঁই পেয়ে সে অন্যের শস্যক্ষেতে আগাছা বাছাই-এর কাজ করে এবং তার বিনিময়ে কাউন পায়। এভাবে কায়ক্লেশে দুই সন্তান নিয়ে জীবন বাঁচায় আর স্বপ্ন দেখে ভবিষ্যতের।...

১৯৯৮ সালের বন্যায় আবার ভেসে যায় কুন্দেরপাড়া, তবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে চরের প্রায় মাঝামাঝি গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের উদ্যোগে নির্মিত বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র। বাকী সবার ঘরের মতো আলেমাদের ঘরেও ঢুকে বন্যার পানি। তার বাবা ওমর আলী ও মা মনোয়ারা বেগম পাঁচ সন্তানের মুখের আহার নিয়ে চিন্তিত। কারণ ঘরে খাবার নেই, জ্বালানী নেই। ধান-ভানার ঢেঁকিও পানির নিচে গিয়েছে। আলেমাকে ফেলে বাকী সবাইকে নিয়ে তারা যায় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রে। কারণ আলেমা নিজে দৌড়ে বা সাঁতরে যেতে পারে না; প্রচণ্ড বৃষ্টি ও প্রতিকূল আবহাওয়ায় তাকে বহন করে নিয়ে কে যাবে? প্রতিবন্ধী হওয়ায় এমনিতেই পরিবারে নিগৃহীত ছিল সে। কিন্তু রাতে ঝড় আর বৃষ্টি এতই বেড়ে গেল যে, এর মধ্যে বের হওয়াই দায়। আলেমাকে তাই কেউ নিতে আসেনি। সারারাত সে কোমর পানিতে বসে অঝোর ধারা বৃষ্টিতে ভিজেছে। হায়রে অসহায় আলেমা! তার যে কোথাও যাবার ক্ষমতা নেই। পরদিন ভোরে তার দাদী কোথা থেকে এসে তাকে কোমর পানি থেকে অর্ধজীবন্ত অবস্থায় উদ্ধার করে কুন্দেরপাড়া বন্যা আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে যায়। পরবর্তী ২০ দিন সে এই আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপদভাবে অবস্থান করে। সেখানে তাকে আশ্রয়, খাদ্য ও স্বাস্থ্যসেবা দেয়া হয়।

"মইদে মইদে হামার মাও আসি হামাক দেকি যায়। ও দিন মাও এর সাত মুই যাম নাই। ওমার আরও কতগুলা তাজা ছইল আছে। ওরায় ভালো তাইক। আশ্রয় কেন্দত

দিনগুলানই হামার জেবনের সউগ চেয়ে ভালো দিন আচিলো। খাওনের আগত কেউ হামাক তখনও আগাআগি করইতো না। খুশিতে হামার সেই দিন দুই চোক দিয়া পানি আচছিল।"

["মাঝখানে আমার মা এসে একবার দেখে যায়। সেদিন আর মা'র সাথে যাই নি। আর-তো সুস্থ অনেকগুলো সন্তান আছে। ওরা ভাল থাকুক। আমি আমার জীবনে সবচেয়ে ভাল ছিলাম আশ্রয়কেন্দ্রের সেই কটা দিন। খাবার দেবার আগে কেউ বকা দিত না। আনন্দে আমার চোখে সেদিন জল এসেছিল।"]

বলতে বলতে ছল ছল করে ওঠে আলেমার চোখ।

২০০৪ সালের সর্বগ্রাসী নদীভাঙনের কবল থেকে কোনরকমে বেঁচে যাওয়া লাভলী বেগম এখন কুন্দেরপাড়ার বাসিন্দা। বিগত ১৯ বছরে এ পর্যন্ত পাঁচ বার তার নিজের ও পিতার পরিবার বন্যার কবলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেই স্মৃতিচারণে আজও তার কণ্ঠ ভারী হয়ে আসে। লাভলী যে সময়ের কথা বলেছিলেন তখন তারা কুন্দেরপাড়ার পার্শ্ববর্তী খারজানী গ্রামে বাস করে। ভরা নদীর গতি-প্রকৃতি এতটাই প্রতিকূল যে, কখন কি ঘটে বুঝা দায়। লাভলীর বর্ণনায়:

"মাঝ আইতত দড়িয়ার হাকত আর ভাংগনের গড়গড়িত যখন নিন্দ ভাঙ্গি যায় তখনে বাউলি হাওয়ায় দড়িয়া পাগল্যা হয়া যায়। এক মিনিটের মদ্যেই পানির উতাল ধার বাড়ির আইগনার মাঝত আসিয়া ঘরগুলাক ভাঙ্গিচুরি দড়িয়ার মাঝত ফ্যালা দ্যায়। ছইলগুলাক সাতত দৌড় করি মিচ্ছা একনা স্কুলত ওটি। তকনে চাইরো পাশে দড়িয়ার পানি থই থই কইবার নাইকছে। কি কইরমো ভাবি পাম নাই। কাপালত, তখনে গণোন্নয়নের এ্যাকটা নাও হামার ঘরক তুলিয়া কুন্দেরপাড়া আশ্রয় কেন্দত নিয়া গ্যাল।"

["গভীর রাতে নদীর গর্জন আর ভাঙনের শব্দে আমাদের ঘুম ভেঙে যায় তখন দেখা গেল ঘূর্ণি বিক্ষুব্ধ মাতাল নদীস্রোত। মাত্র এক মিনিটের ব্যবধান। হঠাৎ ক্ষিপ্র গতিতে একটি জলের পাক মুহূর্তেই বাড়ির উঠানের ঘরগুদ্ধ ভেঙে নিয়ে নদীর মাঝে বিলীন করে দেয়। ছেলেপুলে নিয়ে কোনরকমে দৌড়ে স্কুলে উঠি। ততক্ষণে চারদিকে জলে থৈ থৈ। কি করবো ভেবে পাচ্ছিলাম না। কপাল ভাল, এই সময়েই দেখতে পেলাম গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের উদ্ধারকারী নৌকা। তারা আমাদের উদ্ধার করে নিয়ে গেল কুন্দেরপাড়া বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রে।..."]

তারপর থেকে তারা কুন্দেরপাড়াতে বসবাস করতে শুরু করে।

দুর্যোগের সাথে লড়াই করে শেষ পর্যন্ত কুন্দেরপাড়ায় টিকে গেছে পিঞ্জিরা বেগম। কুন্দেরপাড়ায় তার এই আত্মবিশ্বাস আছে যে, এখন বন্যা অন্তত পিঞ্জিরাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে না। কারণ, এই চরের রয়েছে নিজস্ব বন্যা ও নদীভাঙন ব্যবস্থাপনা, নৌকা আর বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র। বিগত জীবনের অনেক ভরসাহীনতা আর ক্ষয়ক্ষতির পর এখন কুন্দেরপাড়াই লাভলীর জন্য পরম আপনস্থল। আলেমা এখন আর মৃত্যুর প্রহর গুণে না, এই আশ্রয়কেন্দ্র তার মনে দিয়েছে সাহস আর আত্মবিশ্বাস। তার মনে হয়েছে কেউ যদি

সহায়তা করে সে আরো ভালভাবে বাঁচতে পারবে। এদের সবার আস্থার প্রতীক হিসেবে রয়েছে কুন্দেরপাড়ায় গণ উন্নয়ন কেন্দ্র গৃহীত জীবন-মান উন্নয়নের নানা কর্মসূচি।

বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র : স্বপ্ন আর চালিকাশক্তি

গাইবান্ধা জেলা শহরের প্রায় ১৫ কিলোমিটার উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত কামারজানি ইউনিয়নের বেশির ভাগ স্থলভূমির ভৌগোলিক সীমা-ই প্রমত্ত যমুনা-ব্রহ্মপুত্রের ভাঙনে বিলীন। দশকের পর দশক ধরে ইউনিয়নের প্রায় চার/পাঁচ হাজার পরিবার নদীভাঙনের সাথে ভাঙা-গড়ার সংগ্রাম করে জীবন-যাপন করছে। মূলভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন এই ইউনিয়নবাসীর বারো মাস সমস্যা থাকলেও মারাত্মক দুর্ভোগ সৃষ্টি হয় বন্যার সময়। নদীভাঙন রোধ, আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপনসহ আরো অনেক দাবী সরকারের কাছে করে আসলেও অসহায় ইউনিয়নবাসীর দিকে কেউ হাত বাড়ায়নি। উপায়ন্তর খুঁজে না পেয়ে আশ্রয়হীন নিঃস্ব পরিবারগুলোর পক্ষ থেকে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন জিইউকে-এর কাছে তাদের আকুতিগুলো পেশ করে।

গাইবান্ধা জেলায় ১৯৮৮ সালের প্রলঙ্করী বন্যা ও ১৯৯০ সালের ব্যাপক বন্যার তিন বছর পর ১৯৯৪ সালে একটানা অনাবৃষ্টির তথা খরার প্রকোপ চরের জনজীবন ও অর্থনীতিকে মারাত্মক ক্ষতির মাঝে নিপতিত করে। এমতবস্থায় কুন্দেরপাড়ায় জীবিকা সংকট দেখা গেলে চরের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা ধরে রাখার লক্ষ্যে অক্সফাম-জিবি'র সহায়তায় 'কাজের বিনিময়ে অর্থ' কর্মসূচি বাস্তবায়নের করা হয়। যেহেতু ইতিপূর্বে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কুন্দেরপাড়া ও পার্শ্ববর্তী চরের অধিবাসীদের সাথে অনেক দফা আলোচনা ও অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনার মাধ্যমে বের হয়ে আসে যে, জরুরীভাবে বন্যার ঝুঁকি থেকে গ্রামবাসীদের রক্ষা করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

সমাধান হিসেবে কুন্দেরপাড়া-সহ আশেপাশের কয়েকটি গ্রামের জনগণের প্রাণের দাবী ছিল একটি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা। এর প্রেক্ষিতেই অক্সফামের 'কাজের বিনিময়ে অর্থ' কর্মসূচির আওতায় কুন্দেরপাড়ায় শুরু হয় গাইবান্ধার প্রথম বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মানের কাজ। মূলত চরবাসী নারী শ্রমিকের উদ্যোগ ও পরিকল্পনায় চরের প্রায় মাঝামাঝি স্থানে আশ্রয়কেন্দ্রের মূল কাঠামোটা গড়ে তোলা হয়। নারী-পুরুষ উভয়েই কাজের জন্য সমান হারে মজুরী পায়।

তবে এই বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মানের কাজ মোটেই আয়াসলব্ধ ছিল না। একটি মহল এর বিরুদ্ধে সর্বদাই লিপ্ত ছিল। প্রথমেই শুরু হলো জমি নির্দিষ্ট করা নিয়ে কারসাজি। বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের জন্য স্থানীয় লোকজন স্বেচ্ছায় জমি দান করার ইচ্ছা পোষণ করে। তবে এলাকার এক প্রভাবশালী মহল এর বিরোধিতা করে। তারা প্রাসঙ্গিক-অপ্রাসঙ্গিক নানান শর্ত জুড়ে দেয়। এরপর শুরু হয় স্বেচ্ছাসেবী কর্মী নিয়োগ নিয়ে দরাদলি ও তদবির। নারী কর্মীদের নিয়োগের বিরোধিতাও আসে প্রবলভাবে। তবে আশ্রয়কেন্দ্র গঠনের

মৌলিক উদ্দেশ্যের প্রতি গ্রামের সাধারণ জনগণের ব্যাপক ঐক্য ও সংহতি ছিল লক্ষণীয়। অবশেষে সব বাধা সরিয়ে গ্রামের এভাবেই গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের উদ্যোগে ও অক্সফ্যাম-জিবি'র সহযোগিতায় কুন্দেরপাড়ায় ১৮ বিঘা (৬ একর) জমির উপর গড়ে উঠে বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র।

প্রথম কয়েক বছর বন্যার পরে আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত করতে হয়। এর মাঠে পরিকল্পনা করে লাগানো হয়েছে বিভিন্ন গাছ –যা গ্রীষ্মকালীন পরিশ্রমী লোকজনকে স্বস্তি দানসহ চরের রুক্ষ পরিবেশে শ্যামলীমা এনে দেয়। এর আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় অন্যান্য সুবিধাদির মধ্যে রয়েছে রোদ-বৃষ্টি থেকে সুরক্ষার জন্য স্টিলের ছাউনি ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য সরঞ্জামাদি, সার্বক্ষণিকভাবে রয়েছে জরুরী উদ্ধারকারী নৌকা, জীবন-বাঁচাতে ভাসমান উপযোগী সরঞ্জামাদি, জরুরী চিকিৎসা ব্যবস্থা, প্রশিক্ষিত ধাত্রীসহ এ্যাম্বুলেন্স বোট, প্রশিক্ষিত ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং তথ্যকেন্দ্রসহ অফিস। নির্মিত হওয়ার পর থেকেই প্রতিটি বন্যাকালীন পরিবারের লোকজন তাদের সহায় সম্পদ নিয়ে এই আশ্রয়কেন্দ্রে উঠে আসে। উদ্ধার ও ত্রাণ তৎপরতার বিভিন্ন কৌশল তারা শিখেছে গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের মাধ্যমে।

এই বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছে চরবাসী। আশ্রয়কেন্দ্রে রয়েছে চরবাসীর জীবন-মান উন্নয়ন ও বন্যা ও নদীভাঙন প্রশমনে নিয়োজিত জিইউকে'র কামারজানি এলাকা কার্যালয়; স্থানীয় লোকজনের নানা ধরণের সেবাপ্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি হয় এখান থেকে। বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্যসেবা ক্যাম্প, আইন-সহায়তা ক্যাম্প, গবাদি পশুর চিকিৎসা ক্যাম্প-এর আয়োজন করা হয় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রে। বর্তমানে কুন্দেরপাড়া ও আশেপাশের গ্রামের নানা ধরণের বিচার-শালিস, সভা, সমাবেশের একমাত্র স্থান হিসেবেও এটি ব্যবহৃত হচ্ছে। আশ্রয়কেন্দ্রটি ঘিরে গড়ে উঠেছে দোকানপাট। সপ্তাহে দুইদিন বাজার বসে, যেখানে নিত্য প্রয়োজনীয় নানা ধরণের জিনিসপত্র যেমন কাপড়-চোপড়, ঔষধ, চাল, ডাল, তরিতরকারি, তেল-সাবানসহ অনেক কিছুই কেনা-বেচা হয়। পাইকারী ক্রেতারা এই বাজারে এসে দ্রব্যমূল্য ক্রয় করে নিয়ে যায়। গ্রামের নারীরাও সহজেই তাদের উৎপাদিত পণ্যগুলো ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে। একপাশে একটি সেলুন আর মোবাইল ফোন সুবিধাও পাওয়া যাচ্ছে। আশ্রয়কেন্দ্রের একপাশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ছাত্র-ছাত্রীর আবাসন সুবিধাসম্পন্ন 'কুন্দেরপাড়া গণ উন্নয়ন একাডেমি' নামক মাধ্যমিক বিদ্যালয় –যা এই চরের অনেক বড় আকর্ষণ। যার ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয় পাশ করা ছেলে-মেয়েদের আর ছিটকে পড়তে হচ্ছে না।

এভাবেই কুন্দেরপাড়ার দুর্যোগপীড়িত জনগণের ক্ষয়ক্ষতি প্রশমন ও জীবন-মান উন্নয়নে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (জিইউকে) এর নিবিড় সংশ্লিষ্টতার শুরু। এর ফলে কুন্দেরপাড়া চরবাসী পায় সাহস, নিরাপত্তা আর আত্মবিশ্বাস। এই আশ্রয়কেন্দ্রটি স্থাপনের পর চরাঞ্চলের মানুষ একটি সমন্বিত শক্তি ও নিরাপত্তা উপলব্ধি করে –যা তাদের প্রেরণা ও চালিকাশক্তি স্বরূপ। তাদের নানা ধরণের স্বপ্ন জাগে এটিকে নিয়ে। দীর্ঘকাল যাবত

তাদের মধ্যে ক্রমাগত যে হারানোর ভয় আর হতাশা সঞ্চিত হয়েছিল তা আস্তে আস্তে মিইয়ে যায়। অন্তত এই আস্থা তাদের মধ্যে হয়েছে যে বন্যা সহসা ভাসিয়ে নেবে না, প্রাথমিকভাবে অন্তত এই আশ্রয়টুকু পাবে তারা। তাদের নিজেদের প্রচেষ্টায় স্থায়িত্বশীল জীবন-মান উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসেবে এ ধরনের একটা মানসিক আশ্রয়ও দরকার ছিল তাদের –যা তারা পেয়েছে এই বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র থেকে। ১৯৯৫ সালে নতুন আশ্রয়কেন্দ্রেই আশ্রয় নেয় ২৮৪টি দুর্গত পরিবার। অন্তত পক্ষে বন্যার সময় একসাথে এখানে আশ্রয় নিতে পারে এলাকার পাঁচ শত পরিবার।

কুন্দেরপাড়া বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের বহুবিধ ব্যবহারের মধ্যে আরো রয়েছে বর্তমানে এটি এই ইউনিয়নের ক্রীড়া ও বিনোদনের অন্যতম কেন্দ্র। ফুটবল, ক্রিকেট, দাঁড়িয়াবাধা, ইত্যাদি খেলার গুরুত্বপূর্ণ ভেন্যু হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এটি। গানের আসর বা নাটকের পালা আয়োজনেরও প্রিয় স্থান এটা।

এই বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র পরিদর্শনে এ পর্যন্ত সরকারি বেসরকারি অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিনিধি এখানে উপস্থিত হয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে সরকারের মন্ত্রী, গুরুত্বপূর্ণ আমলা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার বিশিষ্টজন এবং আগ্রহী পর্যটক ও ব্যক্তিবর্গ। কুন্দেরপাড়াকে একটা ভ্রমণের স্থান হিসেবেও নির্বাচিত করা যেতে পারে।

প্রতিবছর এলাকার লোকজন আশ্রয়কেন্দ্র ও স্কুল সংস্কার করে থাকে স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে। রক্ষণাবেক্ষণ-এর জন্য একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি রয়েছে নারী-পুরুষ মিলে। এই কমিটির সদস্যরা অত্যন্ত সক্রিয়। নিয়মিত সভা, বন্যা পূর্ব-প্রস্তুতিতে স্বেচ্ছাসেবক দল গঠনসহ কর্ম-পরিকল্পনাও করে থাকে। সব মিলিয়ে কুন্দেরপাড়া বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রটি যেন চরাঞ্চলের মানুষের উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে জীবন-যাত্রার ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে।

দুর্যোগ ঝুঁকি ও ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস– কুন্দেরপাড়ার প্রধান অগ্রাধিকার

কুন্দেরপাড়ার অধিবাসীরা শুধু বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র পেয়েই সন্তুষ্ট থাকেনি, তারা চেয়েছে বন্যাজনিত ও অন্যান্য দুর্যোগ-এর ঝুঁকি ও ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে স্থায়িত্বশীল ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন। চরবাসী বন্যা ও নদীভাঙ্গন ঝুঁকি ও ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে দুর্যোগ-পূর্বপ্রস্তুতি, দুর্যোগকালীন করণীয় এবং দুর্যোগ পরবর্তী বিভিন্ন করণীয় সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। কুন্দেরপাড়ার অনেক নারী-পুরুষের জন্য এসব বিষয় এখন আর কোন অপরিচিতি শব্দ নয়, বরং এসব শব্দের অর্থ ও ভেদ তারা বলতে পারে অনায়াসে। সেইসাথে প্রত্যক্ষভাবে এসকল কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে তারা হয়েছে দক্ষ। প্রতিবছর তারা বন্যা-আশ্রয়কেন্দ্রের সংস্কার ও মেরামত ছাড়াও পুরো গ্রামের অবকাঠামো উন্নয়নে তৎপর থাকে।

কুন্দেরপাড়ায় সক্রিয় বিভিন্ন কমিটি চরের উন্নয়নের কাজে নেতৃত্বপ্রদান ও ব্যবস্থাপনা

করে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কারিগরী ও আর্থিক সহায়তা দেয় গণ উন্নয়ন কেন্দ্র। চরে বিভিন্ন সময়ে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে বসতভিটা উঁচুকরণ, রাস্তা উঁচুকরণ, কমিউনিটি-ভিত্তিক উঁচু করে নলকূপ স্থাপন এবং নলকূপের অতিরিক্ত পাইপ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ (যা'তে বন্যার সময়ে নলকূপ প্রয়োজন-অনুযায়ী উঁচু করা যায়), বাঁশের খুঁটি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মজুদ, গো-খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মজুদ, জরুরী ঔষধ মজুদ, প্রতিবছর উদ্ধারকারী নৌকা মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, দুর্যোগকালীন জনগণকে উদ্ধার ও স্থানান্তর কাজে সহায়তাকরণ ইত্যাদি। ইতোমধ্যে ৮০% বসতবাড়ির ভিটা উঁচু হয়ে গেছে।[১৫] এছাড়া প্রয়োজনে জিইউকে থেকে নদীভাঙ্গনের শিকার পরিবারে ল্যাট্রিন বিতরণ, নেপিয়ার ঘাসের কাটিং ও ঘাসবীজ বিতরণ, বাঁশের কঞ্চিকলম চারা বিতরণ, গবাদীপশুর প্রতিষেধক টীকা প্রদান, জরুরী খাদ্য সহায়তা প্রদান, প্রশিক্ষণসহ আরো বিভিন্ন সহায়তা দেয়া হয়।

কুন্দেরপাড়ায় জিইউকের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত সদস্য নারীরা এবং দুর্যোগসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কমিটির সকল নারী-পুরুষ এবং স্বেচ্ছাসেবক দলের সকল সদস্য দুর্যোগ বিষয়ক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।[১৬] এসকল প্রশিক্ষণের মধ্যে রয়েছে, দুর্যোগ-ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ, দুর্যোগ প্রস্তুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ (স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য) ও নলকূপ রক্ষণাবেক্ষণ প্রশিক্ষণ, বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ, ঝুঁকি ও সম্পদের মানচিত্র প্রণয়ন, দুর্যোগ দিবস পালন ইত্যাদি। স্বেচ্ছাসেবক দলকে বিভিন্ন দক্ষতা ও ধারণাগত মডিউলের উপর নিয়মিত ওরিয়েন্টেশন দেয়া হয়। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা তাদের দায়িত্ব হিসেবে চরবাসীকে সচেতন করে থাকে। এছাড়া মাঝে মাঝে দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সচেতনতার জন্য পথনাটক ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

স্থানীয় বিভিন্ন কমিটি নিয়মিতভাবে স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের সাথে যৌথসভায় মিলিত হয়ে গ্রামের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করে থাকে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে দুর্যোগ তহবিল বৃদ্ধি, দুঃস্থ পরিবারের তালিকা রিভিউ, সমিতিভুক্ত সদস্য পরিবারের স্তর নির্ণয়, নিম্নাঞ্চল ও ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিতকরণ, নদীভাঙ্গন রোধে ব্যবস্থাগ্রহণ, বৃক্ষরোপন ও নির্দিষ্ট মেয়াদে এলাকার দুর্যোগ পরিস্থিতির প্রতিবেদন প্রস্তুত করা। এসকল কাজে প্রয়োজনে তারা গণ উন্নয়ন কেন্দ্র বা প্রশাসনের সহায়তা নেয়।

জিইউকে নিয়মিতভাবে জরুরী দুর্যোগ পরিকল্পনা (contingency plan) অনুযায়ী ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে যে ওরিয়েন্টেশন দিয়ে থাকে তাতে কুন্দেরপাড়ার প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করে। দুর্যোগ প্রশমনে বিভিন্ন দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য গ্রামের অনেককে এলাকার বাইরে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ বা পরিদর্শনে পাঠানো হয়েছে –যা তারা গ্রামে এসে অন্যদের সাথে আলোচনা বা তথ্য-বিনিময় করেছে। পুরো চরেই দুর্যোগ

১৫ বার্ষিক প্রকল্প প্রতিবেদন, রিভার বেসিন প্রোগ্রাম (আরবিপি) প্রকল্প, মে ২০০০ থেকে এপ্রিল ২০০২, জিইউকে।

১৬ প্রাসঙ্গিক তথ্য : জিইউকের কর্মীদের জন্য দুর্যোগ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও জেন্ডার প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

প্রশমন একটা নিয়মিত অভ্যস্ত বিষয়, যার প্রতিফলন চরে ঢুকলেই মনে হবে।

ব্রহ্মপুত্রের তীরে নৌকা থামিয়ে এখন সরাসরি হেঁটে বা সাইকেলে দৈর্ঘ্যে বা আড়াআড়ি চলে যাওয়া যায় চরের যে কোন প্রান্তে। যেন মনেই হয় না একসময়ের দুর্গম বন্যাপীড়িত কুন্দেরপাড়া এটা, অথচ আজ তা শান্তিময় বাসযোগ্য জনপদে পরিণত হয়েছে।

শুষ্ক মৌসুমে নৌকায় ব্রহ্মপুত্র পাড়ি দিয়ে তীর থেকে হেঁটে বা সাইকেলে যাওয়া যায় কুন্দেরপাড়া

চরের পশ্চিম তীরটি প্রতিবছরই কমবেশি ভেঙ্গে থাকে। এরই মাঝে হাঁসের খোঁজে আসে কিশোরী

অধ্যায়-৫

হাসি ফোটানো

সমিতি বা দল গঠন

চরাঞ্চলের জনগণের মুখে হাসি ফোটাতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সমস্যার সমাধান ছাড়াও আরো অনেকগুলো সমস্যার সমাধানে ব্রতী হয়েছেন এর অনুঘটক ও আগ্রহী গ্রামবাসী। গ্রামের শিক্ষা, কৃষি, জনগণের ধ্যান-ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি, জীবন-যাপন, অধিকার ও সাম্য, নারীর মর্যাদা, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ, উন্নয়ন সংগঠন ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনতে অনেক ধৈর্য ও নিষ্ঠার প্রয়োজন ছিল। গ্রামবাসীর সাধারণ বক্তব্য, তাদের এই কঠিন আত্মনিয়োগকে সম্ভব করেছে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র –যা তাদের ভাবনায় আলোড়ন তুলেছিল ও সমর্থন যুগিয়েছিল। গ্রামের নারী-পুরুষ সকলেই এক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছে বিশেষ করে নারীরা এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। জিইউকের কর্মীদের অনেক প্রচেষ্টায় এখানকার নারীদের সাথে প্রাথমিক যোগাযোগ স্থাপন করা গেল। এই পর্যায়ে নারীরা সামনে আসতো খুব জড়সড় অবস্থায়, ঘোমটাসহ, কথা বলতো অন্যদিকে ফিরে। দল বা সমিতি করা সম্ভব হয়েছে অনেক পরে। ফতোয়ার ভয় থাকায় সমিতি করার আগে এলাকার পুরুষ ও মাতব্বর শ্রেণীর সাথে অনেক দফা বৈঠক করতে হয়েছে। তার পর ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে বিভিন্ন সমস্যার প্রসঙ্গ ও সমাধানের পথের আলোচনা শুরু হলো। এসব আলোচনা থেকে তারা বুঝতে পারে তাদের মধ্যে সংঘবদ্ধতা দরকার –যা তাদের সামাজিক নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে সহায়ক হবে। এর পরের পর্যায়ে শুরু হয় দল গঠনের কাজ। এক্ষেত্রে গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের বক্তব্য, *"যদি প্রথমেই চরবাসীকে বলা হতো, তোমাদের উন্নয়নের জন্য দল গঠন করতে হবে, তবে বিষয়টি হতো চাপিয়ে দেওয়া। চরবাসী তা গ্রহণ না-ও করতে পারতো। বরঞ্চ তাদের সাথে অনেকদফা আলোচনার পর যখন তারা নিজেরাই এই প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছে তখন আমাদের কাজ সহজ হয়ে গিয়েছে। এসব সাফল্য অর্জিত না হলে এতটা প্রতিকূল পরিবেশের এই পিছিয়ে থাকা দরিদ্র, হতদরিদ্র, বাস্তুহীন শ্রেণীর উন্নয়ন করা সম্ভব হতো না।"*

কুন্দেরপাড়ায় শিক্ষার আলো

আকাশী রঙের স্কুলড্রেস গায়ে রূপালী আর লাকী স্কুল ব্যাগ হাতে দ্রুত হেঁটে যাচ্ছে। ওয়াইনুল হক আর শাহীন আলমের ড্রেসও আকাশি রঙের। এরা সবাই কুন্দেরপাড়া গণ উন্নয়ন একাডেমির অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থী। দ্রুত হেঁটে যাবার কারণ নৌকা আজ একটু দেরী করেছে। ওদিকে ঘণ্টা বাজছে ক্লাসের, তাই এত তাড়া, কত দায়িত্ববোধ! প্রত্যেকের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘামে তাদের ভেতরকার শিক্ষার ঔজ্জ্বল্যই ঠিকরে পড়ছে যেন।

"কুন্দেরপাড়া হচ্ছে স্কুলের গ্রাম' -বলে একগাল হেসে ফেললেন মিয়াজান আলী মন্ডল। কামারজানী ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য তিনি। আঙুলে কড় গুণে বললেন, *'বর্তমানে এই গ্রামে একটি উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়, একটি বেসরকারি রেজিষ্টার প্রাথমিক বিদ্যালয় আর একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। আশেপাশের সকল চরের জন্য শিক্ষার আদর্শ এই কুন্দেরপাড়া। আর এসব হয়েছে শুধুমাত্র গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের জন্য।"*

জীবন-মান উন্নয়নে সর্বাগ্রে প্রয়োজন শিক্ষার –যা কুন্দেরপাড়া গ্রামবাসী অনুধাবন করতে সমর্থ হয়েছিল। তাই শত কষ্ট সত্ত্বেও সন্তানদের তারা স্কুলে পাঠাতে সচেষ্ট হয়েছে –যা মাত্র কয়েক বছর আগেও ছিল কল্পনাতীত।

কুন্দেরপাড়ায় বেসরকারি রেজিস্ট্রি প্রাথমিক বিদ্যালয় আগেও ছিল কিন্তু সেখানে আশেপাশের চরের অনেকে পড়াশুনা করতো বিধায় ছাত্র-ছাত্রীদের চাপ ছিল। ১৯৯৭ সালে কুন্দেরপাড়ায় বয়স্কশিক্ষা কার্যক্রম চালু হয়, তাতে শুধু নারীরাই সুযোগ পায়। এ বছরই ছাত্র-ছাত্রী জরিপ করার পর দেখা গেল অনেক সুযোগ বঞ্চিত শিশু রয়েছে যাদের জন্য এখানে একটি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্র দরকার। ১৯৯৮ সালে কুন্দেরপাড়ায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাকেন্দ্র চালু হয়। উপানুষ্ঠানিক কেন্দ্রে ৭০ থেকে ৮০ ভাগ মেয়ে শিশু সুযোগ পেত।

প্রাথমিক শিক্ষা শেষে এসব শিক্ষার্থীরা কী করবে? – এটা ছিল এসব শিক্ষার্থীদের ও তাদের বাবা-মা'র প্রশ্ন। কারণ আশে-পাশে তো কোথাও মাধ্যমিক বিদ্যালয় নেই। কুন্দেরপাড়া, বাটিকামারী, হাঁসধরা, খারজানীসহ আশেপাশের উপানুষ্ঠানিক ও প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করে মাধ্যমিক শিক্ষা ছিল প্রাই অসম্ভব। প্রায় শতভাগ মেয়ের এসময়েই বিয়ে হয়ে যেত, ফলে ঝরে পড়তো শিক্ষা থেকে। দূরত্ব ও যাতায়াতের সমস্যার কারণে ছেলেদেরও অধিকাংশে ঝরে পড়তো স্কুল থেকে। এসব সমস্যা উপলব্ধি করে জিইউকের একটি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের চিন্তা করে। সাধারণ বন্যার জন্য হুমকি নয় এরূপ উচ্চতায় তৈরী করা জায়গা এবং যোগাযোগের দিক থেকে মধ্যবর্তী অবস্থানে হওয়ায় স্কুলটি প্রতিষ্ঠার চিন্তা করা হয় কুন্দেরপাড়ায়। তারপর এর বাস্তবায়নের জন্য শুরু হয় দিন-রাত ঘুমহারা শ্রম আর নিষ্ঠার বিনিয়োগ। সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন যোগাযোগ ও সমন্বয় এবং গ্রামের জনগণের মতামতের ভিত্তিতে জিইউকে এই স্কুলের জন্য তহবিলের ব্যবস্থাপনা করে। চরের অনেকেই এ ব্যাপারে এগিয়ে আসে। অবশেষে সকল উদ্যোগীদের প্রচেষ্টায় ২০০৩ সালে 'কুন্দেরপাড়া গণ উন্নয়ন একাডেমি' নিম্ন-

মাধ্যমিক স্কুলটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ক্লাস শুরু হয় ২০০৪ সাল থেকে। স্কুলের অবকাঠামো খুবই সুন্দর। বন্যামুক্ত উচ্চতায় যে আশ্রয়কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে তার একপাশে এই টিনসেড স্কুল ও আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীনিবাস। রাতে তাদের লেখাপড়ার জন্য সৌরবিদ্যুৎ প্লান্ট বসানো হয়েছে। সহপাঠ পদ্ধতির শিক্ষা ব্যবস্থায় বর্তমানে স্কুলের ছাত্র ও ছাত্রীর সংখ্যা ২৭৭ জন। ছাত্রের সংখ্যা ১৪৯ জন এবং ছাত্রীর সংখ্যা ১২৮ জন। শিক্ষক সংখ্যা ৭ জন, অফিস সহকারী ১ জন ও দপ্তরী ১ জন। বিদ্যালয়টিতে যদিও ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাদান চলছে তবুও এসএসসি পরীক্ষায় অন্য একটি স্কুলের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন করে পরীক্ষা দেওয়া হচ্ছে। গত তিন বছরের এসএসসি পাশের হার গড়ে শতভাগ। এর মধ্যে এ গ্রেড বা এর উপরের গ্রেড প্রাপ্তের শতকরা হার ৬০ থেকে ৭০ ভাগেরও বেশি। বর্তমানে স্কুলটির জন্য সরকারি স্বীকৃতির প্রক্রিয়া চলছে।[১৭]

গণ উন্নয়ন একাডেমির স্থাপন খরচ ও শিক্ষকদের বেতনের ব্যবস্থা করেছে জিইউকে। এর বাইরে জিইউকে কুন্দেরপাড়ায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার যাবতীয় ব্যবস্থা এবং একটি বেসরকারি রেজিস্ট্রি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষা-উপকরণ সহযোগিতার ব্যবস্থা করেছে –যা গ্রামের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাকে নিশ্চিত করতে সহায়তা করছে।

স্কুলে অন্যান্য শিক্ষা সুবিধাদির মধ্যে রয়েছে দূরের ছাত্রীদের জন্য (নবম ও দশম শ্রেণী) আবাসিক ছাত্রীনিবাস, বন্যা ও এসএসসি পরীক্ষাপূর্ব ছাত্র-ছাত্রী উভয়ের অস্থায়ী আবাসিক ব্যবস্থা, দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে বই বিতরণ, শিক্ষা সফর, নিয়মিত হোম-ভিজিট, অভিভাবক ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, বার্ষিক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা, বেসরকারি রেজিষ্টার বিদ্যালয়ের শিক্ষক ওরিয়েন্টেশন, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন শিক্ষামূলক প্রশিক্ষণে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক অংশগ্রহণ ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে, গাইবান্ধা জেলা পর্যায়ের স্কুলভিত্তিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বরাবরই এই শিক্ষার্থীরা ঈর্ষণীয় সাফল্য লাভ করে থাকে।

২০১০-এর পরীক্ষার্থী রীণা ছাত্রীনিবাসেই থাকে। তার আগের তিন বোন মাধ্যমিক পর্যায়ে পড়তে পারেনি। আসাদুল আর ওমর ফারুকও একই ব্যাচের বিধায় ছাত্রনিবাস পেয়েছে। অষ্টম শ্রেণীর লাভলী জানায় প্রাইমারী শেষ করার পর তার বড় বোন রোজিনাকে বাবা মার আগ্রহে বিয়ে দেয়া হয়, কারণ আশেপাশে হাইস্কুল ছিল না। এরকম উদাহরণ মোটামুটি তাদের সকলের বা আত্মীয়ের পরিবারেই আছে বলে তারা জানায়। অষ্টম শ্রেণীর মাহমুদা, শাহীন আর আনোয়ার আসে পাশের গ্রাম পারদিয়ারা থেকে নৌকায়। বর্ষাকালে তাদের অনেকদিন যাতায়াতের অসুবিধা হয়। রাস্তা ভেঙ্গে গেলে নৌকায় মাসে প্রায় ১০০ টাকা বাড়তি খরচ হয়। যাতায়াতের অসুবিধার কারণে মাহমুদার এ বছর ১৫ দিন স্কুল বন্ধ হয়েছে। অষ্টম শ্রেণীর লাভলীর বাড়ী কুন্দেরপাড়ায়; তার কোন অসুবিধা নেই।

---

১৭ ডিসেম্বর, ২০০৯, কুন্দেরপাড়া গণ উন্নয়ন একাডেমির সংরক্ষিত নথিপত্র ও প্রধান শিক্ষকের তথ্য অনুযায়ী।

ওদের নয় জনের দেয়া তথ্য মতে, তাদের গ্রামগুলোতে এখনো ৩৩% থেকে ৩৫% শিশু স্কুলে যায় না। তাদের স্কুলে বিজ্ঞান বিভাগ নেই, শুধু মানবিক বিভাগ; তাদের প্রায় সকলেরই বিজ্ঞান বিভাগে পড়ার আগ্রহ বেশী। বড় হয়ে ওদের চার জন মেয়ে ও একজন ছেলে শিক্ষক হতে চায় আর তিনজন ছেলে আর্মি বা আর্মি অফিসার হতে চায়।

স্কুল কর্তৃপক্ষ জানায়, তারা এখন স্কুলটির সরকারি নিবন্ধন প্রত্যাশা করছে এবং সে অনুযায়ী চেষ্টা চলছে।

চরের কৃষিতে যোগ হয়েছে নতুন মাত্রা

কুন্দেরপাড়ার কৃষিব্যবস্থা ছিল সনাতনী ধরনের। কামারজানি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক সদস্য কুন্দেরপাড়ার নিবাসী মোঃ আব্দুল কাদের (৫৫) ১৯৮৮ সালে চর জাগার পরের বছর এখানে আসেন। চরের কৃষির আদ্যপান্তই তার গোচরীভূত থাকায় এ বিষয়ে সে স্বাচ্ছন্দ্যে বলতে পারেন। ১৯৯০ সাল পরবর্তী চরের কৃষির পরিবর্তনের ধারাবাহিকতা সম্পর্কে তিনি বলেন,

"আগন-চৈত মাসে ধানের চাষ হইত। তকনে জমিত আবাদ ছিল বাদাম, চিনা, তিষি, কাউন, সাবেন আলু, বরো ধান। তকনে মাত্র এই আবাদি জমির চাষাবাদ কইতো ১২টা চাষা ঘরত (পরিবার)। কালাই (ডাল) এর আবাদ হইতো মুশরী, খেসারী, বুট আর তিল। নাই পানি স্যাচের ব্যবস্থা। দড়িয়ার পাড়ত বালির মধ্যে কুয়া বানেয়া প্যাতলী (তলানী) থেকি পানি আইসতো। সেই পানি খাওয়া ও আর সউগ (সব) কাজ হইতো। বালি মাটি একিনা একিনা ১৯৯২ সালত (সালে) পলি মাটি হইলো। সেই পলিত গমের আবাদ শুরু হইল। ১৯৮৮-১৯৯২ সালত বারোটা চাষা ঘর থেকি ২০০টা চাষা ঘর আবাদ করা শুরু কইরলো। তকনে সাবেক আমলের চাষাবাদ আছিল। শুকনা জমিগুলান নাকান এই চরের মাটির ফসলে সার দ্যাওয়া শুরু হইল। যারা খ্যাতত কাজ করইত ওমার (তাদের) ঘরের তামাম (পুরো) বছরে চাষের কাজ নাই বলিয়া দুই ব্যালা খাবার জোটে নাই। তাই তামরা কাজ উটকাতে বিদ্যাশ (অন্য কোন জেলা বা শহরে) চলি যাইত। এইগুলা আবাদ কইরবার য্যায়া সরকারের কাছ থাকি কোন সাহায্য পাওয়া যাইত না। এই চর অ্যালাকায় ১৯৯৬ সনে গণ উন্নয়নের কর্মীরা আইসলে নয়া করিয়া চরে আবাদি জমির চাষ শুরু হয়।"

গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (১৯৯৬-২০০০) কৃষিক্ষেত্রে সহযোগিতা শুরু করেন সবজি, গম, বাদাম, পেঁয়াজ ইত্যাদির বীজ বিতরণ, চাষ-পদ্ধতির উপর প্রকল্প শুরু করা এবং সার বিতরণের মাধ্যমে। কুন্দেরপাড়া গ্রামের বাসিন্দা (বর্তমানে 'ভোরের বেলা' সমিতির সভানেত্রী) সুরতবানু গণ উন্নয়ন কর্মীর উৎসাহে স্বামীর সহযোগিতায় ১৯৯৬ সাল থেকে কৃষি প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হন। তিনি বলেন,

"গণ উন্নয়নের টেনিং পায়া হামরা বাইগুন, শাকসব্জি, গমের আবাদ শুরু করি। শ্যালো ও টেকিকল আইসলে স্যাচের কাজ শুরু হয়। তকনে এইগলা আবাদি ফসল বাড়ি (বেড়ে) য্যায় আর কাউন, চিনা ও প্যারার আবাদ কমি যায়। সরকারের থাকি কোন সাহায্য না পাইলেও গণ উন্নয়নের ভাইয়েরা হামার সাত সউগ সময় আছিল। এই গম, প্যরা হামার ঘরের ভাতের কষ্ট কমাইছে। প্রকল্পের কাজ শ্যাষ হয়া সব্জি চাষ করি যে লাব পাইছম সেই লাবের ট্যাকা দিয়া দুইখ্যান গরু কিনছম।"

এভাবেই তাদের দিন ফিরতে থাকে।

২০০০ সালের পর থেকে চরের কৃষকদের সাথে আলোচনা করে তাদেরকে ভুট্টা, উন্নত মানের তোষা পাট ও উন্নত জাতের ঘাস চাষে উদ্বুদ্ধ করে জিইউকের কর্মীরা। ২০০৪ সালে এসআরআই পদ্ধতিতে ধান ও বাণিজ্যিকভিত্তিতে শাক-সবজি চাষ শুরু হয় এবং দেশী বড়ই গাছে বিদেশি বড়ই কাটিং এর ফলে বড়ই চাষে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। ২০০৬ সালে প্রকল্পভিত্তিক উৎপাদক দলের কার্যক্রম শুরু হলে তাদের উদ্যোগে বাণিজ্যিকভিত্তিতে সবজি চাষ শুরু হওয়ায় এলাকার কৃষিতে ব্যাপক উন্নয়ন পরিলক্ষিত হয়। এই কৃষকেরা দুর্যোগ সহনীয় পরিবেশে আবাদের উপর বিশেষ প্রশিক্ষিত থাকায় বন্যা সমস্যা মোকাবেলার কৌশল রপ্ত করে এবং এসময়ে বন্যা হবার পরও শাক-সবজি উৎপাদন করে অনেক লাভবান হয়।

বর্তমানে (২০০৯) কুন্দেরপাড়ার ৩৬৬টি পরিবার কৃষির সাথে যুক্ত।[১৮] সুরতবানু আরো জানায়, চরবাসী এখন ভুট্টা চাষ করে লাভবান হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে কাক আর কুকুর ভুট্টা চাষে বিঘ্ন ঘটায়। কাউন-চিনা আর পান্তাভাতে পোড়া-মরিচ খাবার অভ্যাস চরের প্রায় সবাই পাল্টেছে। তারা এখন তিন বেলা ভাত বা রুটির সাথে শাক-সবজি, এবং প্রতি সপ্তাহেই ডিম, দুধ কিংবা মাছসহ অপেক্ষাকৃত ভাল খাবার খায়। সুরতবানুর বিশ্বাস, ধান, পাট আর ভুট্টার চাষ করতে পারলে তারা ভালোভাবেই দিন কাটাতে পারবে।

সূর্যোদয় মহিলা সমিতির সভানেত্রী জোহরা বলেন, কার্তিক মাসে বৃষ্টি না হওয়াতে আমন ফলনে এবার বিরাট ক্ষতি হয়েছে। এ বছর চরে পাটের ফলন ভাল হয়েছে। প্রতি মণ পাট ১১০০ থেকে ১৩০০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়েছে। স্থানীয় বাজারে ধান, পাট ও ভুট্টা বিক্রি হয় না; এগুলো সাধারণত কামারজানী হাট ও সদরে বিক্রি হয়। তবে ফড়িয়ারা আজকাল চরে আসে এবং বাড়ী বাড়ী গিয়ে সব্জি, ধান, পাট ইত্যাদি হাটের পাইকারের চেয়ে কিছুটা কম দরে ক্রয় করে। তারপরেও তাদের পরিবহন খরচ বাঁচে, সময় বাঁচে, কষ্টটাও কম হয়। আগামীতে তাদের নিজেদের দ্বারা বাজার-সংযোগ সম্ভব হবে বলে তারা মনে করেন।

চরের জমিতে (নভেম্বর ২০০৯) ইরি ধান চাষ করতে দেখা গিয়েছে। এছাড়া বেশীরভাগ পরিবারে গরু পালন করতে দেখা গিয়েছে। এসব বাড়িতে কম্পোষ্ট সার তৈরী করে সারের চাহিদা পূরণ করার প্রচেষ্টা ছিল লক্ষণীয়। বাড়িতে হাঁস-মুরগী ও ছাগল পালনের হারও ছিল উল্লেখযোগ্য। এসব পালনে তারা দেশী জাত ও সনাতনী পদ্ধতিই ব্যবহার করছে। বাড়ি বাড়ি দেশী গাভী পালন কিংবা গরু মোটাতাজাকরণের আগ্রহ দেখা গেছে,

১৮ জিইউকের মনিটরিং সেলের দেয়া তথ্য, ডিসেম্বর, ২০০৯

অবশ্য এর অধিকাংশেই ক্ষুদ্র ঋণ বা অন্য কোন প্রকল্পের অর্থায়নে। গবাদি পশুপাখির উন্নয়ন ও চিকিৎসায় জিইউকের প্রতি চরের প্রায় সকলেই কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে এবিষয়ে তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান, চরে গবাদিপশুর স্বাস্থ্যক্যাম্প আয়োজন, সরকারি পর্যায় থেকে ওষুধ ও চিকিৎসা সেবা পাইয়ে দেয়া ইত্যাদি ব্যাপক অবদান রেখেছে। চরের পুকুর বা ডোবায় সারাবছর পানি না থাকায় নিয়মিত মৎস চাষ ততটা সুবিধাজনক হয়নি। মুক্ত জলাশয় থেকে অনেকে মৎস শিকার করে, কেউ কেউ বিক্রি করে।

চরের জনগণ দুর্যোগ-সহনীয় কৃষি প্রবর্তনে ও কৃষির উন্নয়নে যে বিষয়গুলোর প্রতি যত্নবান হয়েছে তা হচ্ছে- সবজি প্লট উঁচুকরণ, বসতবাড়ীতে সবজি বাগান, সয়াবিন চাষ, হাঁস-মুরগী পালন, গরু মোটাতাজাকরণ, মোরগ-মুরগী ও ডিম উৎপাদন, গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগীর ভ্যাকসিন ক্যাম্প, কবুতর চাষ, গো খাদ্য উৎপাদন ও সংরক্ষণ ইত্যাদি। কৃষি বিষয়ক আলোচনাকালে অনেকেই জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত বিভিন্ন প্রভাবকে গুরুত্ব দিয়েছে –যা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এসব প্রভাব-এর মধ্যে রয়েছে, বন্যা, বৃষ্টিপাত, শীত ইত্যাদির সময়সূচি আগেরমতো থাকছে না। তাই কৃষিকাজে প্রায়শই তারা বুঝে উঠতে পারছে না কখনা কী করতে হবে। এসব ক্ষেত্রে তারা সরকারি বেসরকারি পর্যায় থেকে নির্দেশনা প্রত্যাশা করে থাকে।

জীবন-মান উন্নয়নে ফিরেছে আত্মবিশ্বাস

কুন্দেরপাড়ায় বন্যা প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে জিইউকের কর্মীরা এখানকার জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছে আরো অনেক বিষয়ে। পুনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় উঁচু করা বসতবাড়ীতে চরবাসী আগের চেয়ে শংকামুক্ত, নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে। বসতবাড়ীকে বন্যামুক্ত রাখতে নিজেদের উৎসাহে দলবদ্ধভাবে বসতবাড়ী উঁচু করে দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জন করেছে। এছাড়া ১৯৯৬ সাল থেকে দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারীদের আয় ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কৃষি ছাড়াও বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। আয়ের উৎস সৃষ্টি এবং পরিবারের আয়-বৃদ্ধিতে সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান ও উপকরণ সহায়তা দেয়া হয়েছে। এসব কার্যক্রমের মধ্যে কৃষি সহায়তা, গবাদি পশুপাখি পালন, বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি, হস্তশিল্প ও দর্জিকাজ অন্যতম –যা নারীর বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখছে। আসমা বেগম এসকল কর্মসূচিভুক্ত একজন সুফলভোগী। আসমা আগে যখন অন্য চরে থাকতো তখন তার পরিবার বিশ বছরে চৌদ্দবার নদীভাঙনে বাড়ীঘর সবকিছু হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল। ১৯৯৭ সালে এই চরে আসার পর জড়িত হয় জিইউকের বিভিন্ন কর্মসূচির সাথে। আসমা জানান:

"কুন্দেরপাড়া এই গাঁও উঁচা করার কাজ শুরু কইরলে হামারে মাইগ ছইলক নিয়া এখ্যান জায়গা পাই। এটি হামার বড় পাওয়া যে দরিয়ার পানি আর এটি আইসবে না। এ্যারে মাঝত আশ্রয় কেন্দ কইরতে মাটি কাটার কাজ পাই। পতি দিন পাইতাম ৬০ ট্যাকা অতে থাকি কিছু সঞ্চয় করি। পরত জোছনা মহিলা সমিতির সদস্য হয়া যাই। এটি হামি শিকবার পাই কি করি অভাব মুক্ত পরিবার গটন করা যায়। সমিতি থ্যাকি টেনিং নিয়া সোয়ামী হায়দার আলীক দিয়া কাজ শুরু করি। অ্যাক বছর পার হয়া সবজিচাষ আর মুরগী পালিয়া যে লাব পাই তা দিয়া এ্যাকান গরু কিনি তার দ্যাকশুন হামি নিজেই করি। সোয়ামী জমিত চাষ করে তার ট্যাকা দিয়া সংসার গোছান শুরু করি। হামার সোয়ামীক সাত করি দুইজন পরামর্শ করিয়া টিনের বাড়ি, ছয়খান গরু, হাঁস-মুরগী আর চাইর বিগা জমি করিয়া হামরা দুইজনে মিলিমিশি সংসার করি। বড় বেটির বিয়া দিছি আর ছইলেরা হামার লেকাপড়া করইবার নাইগছে। এ্যাকন হামরা কারো দুয়ারত যামনা।"

কুন্দেরপাড়া গ্রামের প্রায় সকল দরিদ্র ও হতদরিদ্র পরিবারই এধরনের কার্যক্রমের মাধ্যমে নিজেদের অবস্থাকে উন্নত করতে সক্ষম হয়েছেন। গ্রামের লোকজন সচেতন হয়েছে। নারী-পুরুষ উভয়ই এখন আয়-উপার্জনের কাজ করে। এসব বিষয়ে সামাজিক বিধিনিষেধ ও নিজেদের ভীতি অনেকাংশে কমে গিয়েছে। জন্মনিয়ন্ত্রনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণে চরের অধিকাংশ দম্পতিই সচেতন হয়েছে। এসকল বিষয়ে চরে এখন অনেক সরকারি-বেসরকারি কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

বন্যা-আশ্রয়কেন্দ্রকে ঘিরে স্থানীয় বাজারব্যবস্থা গড়ে উঠায় গ্রামের নারী-পুরুষ তাদের উৎপাদিত পণ্য সহজে ক্রয়-বিক্রয় করতে পারছে। আশানুরূপ মূল্য প্রাপ্তিতে পতিত জমির ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি বৃদ্ধি পেয়েছে স্থানীয় পর্যায়ে কৃষকদের বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণের হার। আধুনিক পদ্ধতিতে গরুপালন ও গরু মোটাতাজাকরণ করতে চরাঞ্চলের জনগণের আগ্রহ বেড়েছে। গরুর খাদ্য সম্পর্কেও এখন তারা সচেতন। আগে নদী ভাঙনের ফলে চরের কাঁশবন ধ্বংস হলে প্রচণ্ড গো-খাদ্য সংকট দেখা দিত। এখন জিইউকের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ হয়ে গ্রামবাসীরা বিভিন্ন জাতের ঘাস, ভূট্টা ইত্যাদি গো-খাদ্য চাষ করে সুফল পেয়েছে এবং নিজেরাই আগ্রহী হচ্ছে।

মাত্র একদশক আগেও যেসকল বিষয়ে চরবাসীরা ছিল প্রায় অজ্ঞ,[১৯] আজ সেসব বিষয়ে তাদের পরিবর্তন অনেকটা চোখে পড়ার মত। প্রতিবন্ধিতার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন, পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ, অধিকার, জলবায়ু-পরিবর্তন ও নিজস্ব অবস্থান বিশ্লেষণে তাদের সচেতনতা প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। চরবাসীদের বক্তব্য, জিইউকের দেয়া প্রশিক্ষণ তাদের এসব ব্যাপারে সচেতন হতে সহায়তা করেছে।

অধিকার, জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন

কুন্দেরপাড়ায় নারীরা মনে করে, চর বা মূলভূমি –যাই হোক না কেন, দরিদ্র নারীদের অধিকার, নারী-পুরুষ সমতা, নারীর ক্ষমতায়ন কিংবা নারীর প্রতি সহিংসতা ইত্যাদির ক্ষেত্রে আগে পার্থক্য খুব বেশী ছিল না। তবে চরের নারীরা বেশি নিরাপত্তাহীন ও নির্যাতিত ছিল এদিক থেকে যে, পরিবারের পুরুষ সদস্যরা বছরের প্রায় তিন থেকে ছয় মাস কাজের সন্ধানে কোন শহরে ছুটে যায় এবং তখন এই পরিবারের সকল দায়-দায়িত্ব

১৯ জিইউকে আয়োজিত বেজলাইন সার্ভে রিপোর্ট-১৯৯৫

নারীরাই বহন করে থাকে। এই সময়য়ে নারীদের কষ্ট আরো বেড়ে যায়। পুরুষ যেখানে কাজ করতে যায় সেখানে অন্তত সে খেতে পারে, কিন্তু চরের নারীরা এই সময়ে সন্তান-সন্ততি নিয়ে প্রায়ই অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটায়। চরে এ সময়ে বিভিন্ন ফন্দিবাজ, পাচারকারী বেড়ে যায়। চরের সমাজ-মানসিকতা সাধারণত নারীর বিপক্ষে। যে কোন ভুল বা অবিচারের কারণে তাই নারীকে বড় মাসুল দিতে হতো। পরিবারের সকল দায়-দায়িত্ব পালন, কৃষিতে ব্যাপক অবদান রাখা ও উপার্জনে পুরুষকে বিস্তর সহযোগিতা করলেও তার স্বীকৃতি মিলতো না। নারীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সম্পত্তি বঞ্চিত হতো। চরে যৌতুক, বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহের প্রকোপ ছিল অত্যধিক।

উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে নারী-পুরুষের অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্তগ্রহণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই কুন্দেরপাড়ায় যে কোন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব সৃষ্টির বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। এক্ষেত্রে সমিতিভুক্ত বা বিভিন্ন কমিটিভুক্ত নারীকে বিভিন্ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয় –যা তাকে পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে নারীর মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে নারী-পুরুষের বৈষম্য কমাতে ভূমিকা রাখে। সমিতির সকল সদস্যাই নারীর অধিকারসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণ পেয়েছে –যা তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নারী-পুরুষের বৈষম্যের দূরত্ব কমায়।

বর্তমানে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে চরের নারীদের অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেছে। নিজস্ব আয়, কর্মসংস্থান ও দক্ষতা অর্জনসহ নারীরা এখন ইউনিয়ন পরিষদ, বিভিন্ন বিদ্যালয় কমিটি, মক্তব কমিটি, মাদ্রাসা কমিটি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র কমিটি, চর/গ্রাম উন্নয়ন কমিটিতে নারীদের অংশগ্রহণ প্রতিনিধিত্ব ও নেতৃত্ব সৃষ্টিতে সহায়তা অব্যাহত রয়েছে। সমিতিভুক্ত বেশ কিছু সদস্য উল্লেখিত কমিটিতে নেতৃত্ব প্রদান করে আসছে। এই নারীরা তাদের পরিসর থেকে এলাকায় বাল্যবিবাহ, তালাক, বহুবিবাহ, যৌতুক, বিচ্ছেদসহ পারিবারিক এবং ভূমি-সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব-নিরসনে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

শাহিনা বেগম কুন্দেরপাড়ার এক সাহসী ও সচেতন নারী। স্বামী, এক ছেলে ও এক মেয়ে নিয়ে তার সংসার। দারিদ্র্য শিক্ষাহীনতা, নদীভাঙ্গন, ইত্যাদি তার অতীত জীবনের নিদারুণ বিভীষিকা। মাত্র সাত বছর বয়সে বাল্যবিবাহের পিঁড়িতে বসতে হয়েছিল তাকে। এ পর্যন্ত মোট ছয় বার নদীভাঙ্গনে সর্বস্বান্ত হয় তার ঘর গেরস্থালী। ২০০০ সালে গণ উন্নয়নের প্রকল্পভুক্তি তার নির্দেশনাহীন জীবনে এঁকে দেয় সঠিক পথরেখা। বিভিন্ন দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ক্রমে ক্রমে স্বাবলম্বী হয়ে উঠে সে ও তার পরিবার। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিই শুধু নয়, নারীর ক্ষমতায়ন, অধিকার সুরক্ষা, দুর্যোগ মোকাবেলার দক্ষতা, সংগঠন পরিচালনাসহ বিভিন্ন বিষয়ে সে গ্রামের মধ্যমণি। অনেকেই তার কাছে এসে দীক্ষা নেয়, পরামর্শ নেয়। অক্সফাম-জিবির সহায়তায় গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের মাধ্যমে শাহীনা ২০০৮ সালের ১ মার্চ প্রায় দুই সপ্তাহের জন্য ইংল্যান্ড সফরে যান। সেখানে তিনি বিভিন্ন স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক মিডিয়ার সাথে কথা বলেন, কয়েকটি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া

চেম্বার অব কমার্স, ব্রিটিশ পার্লামেন্ট, অক্সফোর্ডসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যালয়ে ভ্রমণ করেন। শাহীনা জানান, বর্তমানে স্বামী-সন্তান নিয়ে সুখী জীবন-যাপন করছেন।

স্বাস্থ্য ও পরিবেশ উন্নয়ন

চর অঞ্চলে সংক্রামক ও অন্যান্য রোগ-ব্যাধি মোকাবেলায় ওষুধ, চিকিৎসক ও চিকিৎসা ব্যবস্থার সুযোগ না থাকায় প্রায়ই জীবনহানিসহ মারাত্মক ক্ষতি হতো। অনিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের অপ্রতুলতার জন্যও সৃষ্ট রোগব্যাধি চরের নিয়মিত চিত্র ছিল।

চরের জনগণের স্বাস্থ্যের উন্নয়নে প্রথমে প্রতিরোধক ও পরে প্রতিষেধক এবং কমিউনিটি-ভিত্তিক জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের উপর জোর দেয়া হয়।

"*জিইউকের সমিতির সদস্য হইলেই ওমার জন্য ভাল ল্যাট্রিন আর টিউবওয়েলের ব্যবস্থা কইরবার লাগত। এর মাজত (মধ্যে) কাউর ল্যাট্রিন নদীত ভাংগি গ্যালে তাক বিনা পয়সাত ল্যাট্রিন দেওয়া হইত*"– জানায় তেপান্তর মহিলা সমিতির সদস্য জরিফুল বেগম।

বর্তমানে চরের প্রায় সকলের বাড়িতেই রয়েছে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন আর সকলেই টিউবওয়েলের পানি পান করে। জিইউকে থেকে নিয়মিত এসব টিউবওয়েলের পানির আর্সেনিক ও লৌহের মাত্রা পরীক্ষা করা হয়।

১৯৯৫ সালে কুন্দেরপাড়া বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রে প্রথমবারের মতো আশ্রয় গ্রহণকারীদের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় -এসময়ে আশ্রয়কেন্দ্রে একজন মায়ের সন্তান প্রসব হলেও অপ্রতুল সেবা ও পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণে জন্মের ৩৬ ঘণ্টা পরে শিশুটির মৃত্যু হয়।[২০] এই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে আশ্রয়কেন্দ্রের মাধ্যমে জরুরী ও স্বাভাবিক সকল অবস্থায় গ্রামের মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়।

শিশুর শারীরিক ও মানসিক দিককে বিবেচনায় রেখে বন্যার কালে অন্যান্য আয়োজনের সাথে 'শিশু সুরক্ষা কেন্দ্র' খোলা হয়। এর মাধ্যমে শিশুর জরুরী খাদ্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য-পরিচর্যা এবং খেলাধুলার ব্যবস্থা রাখা হয়। শিশু সুরক্ষা কেন্দ্রে শিশুকে নিরাপদে রেখে এর মা-বাবা যা'তে বন্যা মোকাবেলা ও জীবন-নির্বাহের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে পারে সেই ব্যবস্থা করা হয়।

স্নিগ্ধা মহিলা সমিতির সদস্য মমতা বানু জানায়, "*পোয়াতিগুলার (গর্ভবতী ও প্রসূতিদের) বেলাত (জন্য) চরত যখন ম্যালা (অনেক) ভুল ধারণা আছিল। আগত (আগে) বুঝছিনো পোয়াতি হইলে কম খাওয়া নাগে, সমিতির আপাগুলার কাছত থাকি শুনছি কম নওয়ায় (নয়) বরং ম্যালা খাওয়া নাগে। আগত চরত পোয়াতির ছৈল (বাচ্চা) হওয়ার সময়ত*

২০ সাক্ষাৎকারে জানান গণ-উন্নয়ন কেন্দ্রের সমন্বয়কারী আঞ্জুম নাহিদ চৌধুরী –যার উপর একটি প্রকাশনাও রয়েছে।

ম্যালা অসুবিধা আছিল। একবার একটা পোয়াতির খুউব খারাপ অবস্থা হছিল কিন্তু তাক উয়ার ঘরের কাইও (কেউ) ডাক্তারের গোড়ত নিয়া যাবার চায় নাই। হমারগুলার চিল্লা হাল্লাত (আপত্তির মুখে) তাক নাওয়ত (নৌকা) আর বাঁশের চাংগত (বাঁশের মাচার বাহন যা কাঁধে করে বহন করে) করি সদর হাসপাতালত নিয়া যাবার পরত স্যাটে কোনা ডাক্তারের ভাল চিকিৎসাত ভালোয় ভালোয় পোয়াতির ছৈল হয়। এরপরত জিইউকে থাকি ধাত্রী টেনিং শুরু কইরলে চরত থাকিয়া ম্যালা মানুষ টেনিং নিছিলো। টেনিং পায়য়া ধাত্রীগুলা ঔগলা সময় বুঝবার পারছিল কোনগুলা সময় পোয়াতির ছৈল বাড়িত হইবে আর কোনগুলা সময়ত বাড়িত ছৈল হওয়া যাবার নয়।"

কুন্দেরপাড়ার নদীর ঘাটে আসতেই দেখা গেল সাদা রঙের বোটে প্রসবকালিন সেবা প্রদানের ব্যবস্থাসহ 'ভাসমান এ্যাম্বুলেন্স' (বিশেষভাবে সজ্জিত জরুরী চিকিৎসার সুযোগসম্পন্ন বোট) যে কোন জরুরী মুহূর্তে চরের জনগণকে চিকিৎসা ও বহন করে মূলভূমিতে নিয়ে যেতে প্রস্তুত থাকে বোটটি। চরে গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের কার্যালয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর মাধ্যমে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান ছাড়াও একজন প্যারামেডিক্স নিয়মিত চরের স্বাস্থ্যের খোঁজখবর রাখে। গণ-উন্নয়ন কেন্দ্রের মাধ্যমে বন্যা আশ্রয় কেন্দ্রে আয়োজন করা হয় 'হেলথ ক্যাম্প'। একসাথে অনেক লোকের মাঝে এভাবে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা দেয়া হয়। চরে বর্তমানে সকল গর্ভবতী ও প্রসূতি মা টীকা গ্রহণ করে। জন্মের পর শিশুর টীকা গ্রহণের সহায়তা করা হয়। অনেক সমিতির সদস্যই প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ক প্রশিক্ষণ পেয়েছেন যারা সমিতিতে ও পরিবারে এ বিষয়ক শিক্ষা অন্যের কাছে পৌঁছে দেন। নিয়মিত কর্মসূচির মধ্যে আরো রয়েছে প্রশিক্ষিত ধাত্রীদের মাসিক ওরিয়েন্টেশন, পল্লী চিকিৎসক প্রশিক্ষণ ও দ্বি-মাসিক রিফ্রেসার্স এবং স্বাস্থ্য কার্ড এর মাধ্যমে সেবা প্রদান।

গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের কামারজানি এরিয়া ম্যানেজার সেলিনা বেগম শিউলীকে দেখা গেল কুন্দেরপাড়ার কার্যালয়ে চরের শিশুর জন্ম-মৃত্যুর চার্ট তৈরী করছেন। তিনি নিয়মিতই এটা আপডেটেট করেন। বর্তমানে এই চরে শিশু মৃত্যুর হার আগের তুলনায় অনেক কম। তার দায়িত্বে মজুদ দেখা গেল কুন্দেরপাড়ার দুর্যোগকালের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জমাদি, ঔষধ ও স্যালাইনসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য উপকরণ। চরবাসীদের মধ্যেও অব্যাহত থাকা বিভিন্ন বিষয়ক স্বাস্থ্য সচেতনতা কর্মসূচির তথ্য পাওয়া গেল।

চরের পরিবেশের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন খুব ফলপ্রসূ হয়েছে। বর্তমানে চরে একশত ভাগ স্যানিটেশন কাভারেজ থাকায় পরিবেশ ভাল হয়েছে। জিইউকের বৃক্ষরোপন কার্যক্রমের আওতায় লাগানো চরের গাছগুলো এখন বড় হয়েছে, প্রতিবছর নতুন নতুন বৃক্ষরোপন হচ্ছে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ও মাটির ক্ষয়রোধ এবং জনগণের আয়ের উৎসের লক্ষ্যে নার্সারী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। সংস্থার নিজস্ব নার্সারী ছাড়াও উপকারভোগী পর্যায়ে নার্সারী তৈরীতে সহায়তা প্রদান করা হয়। এই সকল নার্সারীতে শাক-সবজি ছাড়াও বিভিন্ন কাঠজাত, ফলদ ও ভেষজ চারা উৎপাদন করা হয়ে থাকে।

কর্ম-এলাকার জনগণকে বৃক্ষরোপনে উদ্বুদ্ধ করার জন্য সংস্থার কর্মীগণ সমিতির সাপ্তাহিক সভায় বৃক্ষ রোপনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করেন।

সাংগঠনিক সক্ষমতা উন্নয়ন

একদা পারস্পরিক ঝগড়া-কলহে লিপ্ত চরবাসীর মধ্যে তৈরী হয় সম্প্রীতি আর সাংগঠনিক শক্তি। চরের দুর্যোগ পূর্ব-প্রস্তুতি ও দুর্যোগ চলাকালিন স্থানীয় জনগণের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমানোর লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ও পারস্পরিক সহায়তার জন্য চরভিত্তিক বিভিন্ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। এসব কমিটির মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন বিদ্যালয় কমিটি, মক্তব কমিটি, মসজিদ কমিটি, দুর্যোগ কমিটি, বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র কমিটি, চর/গ্রাম উন্নয়ন কমিটি। প্রতিটি কমিটি নারী-পুরুষ এর সমন্বয়ে গঠন করা হয়েছে। এই কমিটির সদস্যগণ প্রতি দুই-তিন মাস অন্তর একত্র হয়ে দুর্যোগ সংক্রান্ত বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ, কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করে থাকে। উল্লেখ্য যে, অত্র এলাকার জনগণ এই আশ্রয়কেন্দ্রগুলো নিজেরাই সংরক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করে থাকে।

সাংগঠনিকভাবে কাজ করে চরের জনগণ এখন অভ্যস্ত। তাদের সাংগঠনিক শক্তি ও পদ্ধতিও এখন অন্যান্য গ্রাম অনুকরণ অনসরণ করছে। এভাবে কুন্দেরপাড়ায় তৈরী হয়েছে স্বাবলম্বী একটি কমিউনিটি যারা দুর্যোগ মোকাবেলাসহ নিজেদের ও গ্রামের উন্নয়নে সফলতা আনতে সক্ষম হয়েছে।

কুন্দেরপাড়ার সংগ্রামী নারী

অধ্যায়-৬

কুন্দেরপাড়া : কালজ থেকে কালোত্তর

আজকের কুন্দেরপাড়া

কি বর্ষা কি শীত। সারা বছরই যেন কুন্দেরপাড়া শ্যামলিমা বাংলার প্রতিকৃতি। দুর্যোগের ক্ষত শুকিয়ে এর অবকাঠামো অনেকটাই নিরাপদ চরবাসীর কাছে। চরের বুকে উঁচু রাস্তা, উঁচু বসতবাড়ী, সুপরিসর বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র, সার্বক্ষণিক পরামর্শদাতা ও বন্ধু জিইউকের শাখা কার্যলয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও তিন তিনটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মক্তব, মসজিদ, বাজার, যোগাযোগ সাধনকারী নৌকা, উদ্ধারকারী নৌকা, এ্যাম্বুলেন্স বোট, জরুরী মজুদকৃত ওষুধ, ত্রাণ, গোখাদ্য –এসব এখন এই চরের সম্পদ। এর সাথে যোগ হয়েছে এই চরের সংগ্রামী অধিবাসী। এরা এখন দক্ষ ও সক্ষম বন্যাজনিত ক্ষয়ক্ষতি প্রশমনে। এরাই একটি জনপদের দীর্ঘ ছন্নছাড়া পরিচিতিকে ঢেকে নিজেদেরকে সাবলম্বী করতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পথে অবদান রেখেছে।

১৯৯৭ সালের পরের যে কোন বড় বন্যায় তেমন কোন ক্ষয়ক্ষতির আচর লাগেনি কুন্দেরপাড়ার অধিবাসীদের। জীবনের নিরাপত্তাসহ তাদের সম্পদ সুরক্ষার মাধ্যমে জীবন-যাত্রা অব্যাহত রাখতে সমর্থ হয়েছে তারা। বন্যা আশ্রয় কেন্দ্রে ধান সিদ্ধ, শুকানো ও ভাঙ্গাতে পেরেছে তারা। বিভিন্ন কুটির শিল্প ও অন্যান্য কাজকর্মেও নির্বিঘ্নে চালিয়ে যেতে পেরেছে। বসতভিটা উঁচু হওয়ায় গাছপালা ও ঘরের মাচায় অনেক জিনিষপত্র সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়েছে। নৌকার সহায়তা পেয়েছে। আশ্রয়কেন্দ্র থেকে সেয়া চিকিৎসা সেবাও পেয়েছে তারা। এজন্য বন্যাসহনীয় জীবন-যাত্রায় তারা নিজেদেরকে স্বালম্বিতার পথে ধাবিত করতে পেরেছে। কুন্দেরপাড়ার মানুষ এখন বন্যায় সহসাই আশ্রয়কেন্দ্রে আসে না; কারণ তারা নিজেরাই বন্যার সাথে তাল রেখে তাদের বাড়ী উঁচু করেছে। কুন্দেরপাড়াকে এখন 'কায়েম এলাকা' হিসেবে গণ্য করতে চায় এর বাসিন্দারা। তাদের অনুকরণ ও অনুসরণের প্রবণতা লক্ষণীয় হয়েছে অন্যান্য চরেও।

একদা শিক্ষাবঞ্চিত অন্ধকারাচ্ছন্ন কুন্দেরপাড়ায় এখন রাতদিন শিক্ষার্থীদের অধ্যবসায় চলে। পূর্বপুরুষের বহু আরাধ্য স্বপ্নকে বাস্তবে ফলাতে এটুকু কষ্ট তারা করতে রাজি। বিদ্যুত আসেনি এখানে, তাই রাতের বেলা সৌরবিদ্যুতের আলোতেই চলে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি। এই প্রত্যন্ত চর থেকেই তো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় এ গ্রেড ফলাফল নিয়ে

আসে ওরা।

শুধু লেখাপড়া নয়, শরীরচর্চার প্রদর্শণীতেও এই স্কুলের সুনাম বেশ ছড়িয়েছে। ইতোমধ্যে গাইবান্ধা জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিবসে কুন্দেরপাড়া স্কুলের শিক্ষার্থীদের প্রদর্শণী সকলের মন কেড়েছে। চরের শিক্ষার্থীদের পুরস্কার গ্রহণের থলিটা বেশী ভারী বলেই দাবী ওঠেছে চরের জন্য আলাদা কোঠা করার।

মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপনীর পর ছাত্র ও ছাত্রীরা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। ইতোমধ্যে কয়েকজন শিক্ষার্থী ভাল কলেজে ভর্তিও হয়েছে। যাদের মা-বাবা জীবিকার কারণেই মাটি কেটে গড়েছিলেন কুন্দেরপাড়া স্কুলের ভিত্তি তাদের সন্তান ঐ স্কুল থেকে ভাল ফলাফল করে কলেজে ভর্তি হওয়া নিঃসন্দেহে ভাল অর্জন।[২১] শিক্ষার মাধ্যমে গ্রামের লোকজন অনেকাংশে আধুনিক জীবন সম্পর্কে বুঝতে পেরেছে। কুন্দেরপাড়ার অনেকের আশাবাদ, আগামী ১০ বছরের মধ্যে এই এলাকায় প্রতি পরিবারে একজন করে উচ্চ শিক্ষিত নারী বা পুরুষ থাকবে।

আগে যারা লেখাপড়ার সুযোগ পায়নি তারা সন্তানদের লেখাপড়া থেকে বঞ্চিত করতে চায় না। বাটিকামারীর হাওয়া বেগম কিংবা হাঁসধরা গ্রামের মর্জিনা সুযোগহীনতা ও অর্থাভাবে বড় সন্তানদের লেখাপড়া করাতে না পারলেও তাই ছোট ছেলেমেয়েদের ভর্তি করিয়ে দিয়েছে কুন্দেরপাড়া হাইস্কুলে। একদা বাল্যবিয়ের কারণে লেখাপড়া বন্ধ করা গোলবানু, নূরজাহান ও সোহাগীরা আবার এসে উপানুষ্ঠানিক কোর্স সম্পন্ন করে গেছে। গণ উন্নয়ন পরিচালিত উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের ছাত্রীই বর্তমানে বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা হয়েছে। শিক্ষার প্রসারের সাথে সাথে কুন্দেরপাড়ায় উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে বাল্যবিবাহ ও শিশু শ্রমের হার। জেলার এই অবহেলিত অঞ্চলের নারী-পুরুষদের ধূসর জীবনের অন্ধকার ঘুচিয়ে টেকসই জীবন-জীবিকার মূল ভিত্তি গড়ে তুলে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করার যে স্বপ্ন ছিল জিইউকের তা ক্রমান্বয়ে বাস্তবে রূপ নিতে চলেছে।

চরের কৃষির বিবর্তন চরবাসীর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এনে দিয়েছে। চরবাসীর মাধ্যমে গবেষণা আর অভিনবত্বের একপর্যায়ে এখন দুর্যোগ-সহনীয় পরিবেশে ও "কৃষি এখন লাভজনক ক্ষেত্র"। গ্রামবাসী গবাদিপশুপালনে এনেছে জাগরণ। বিকল্প-কর্মসংস্থান, আয়, পুঁজি, সম্পদ বৃদ্ধিকরণ এসব এখন কুন্দেরপাড়ার সাধারণ প্রবণতা। বর্তমানে গ্রামের অনেকেই এখন সৌরবিদ্যুতসহ বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তির প্রতি উৎসাহিত হচ্ছে। তাদের সচেতনতা ও সামর্থ বৃদ্ধির কারণে এখন উন্নতির পথে অধিকতর বিনিয়োগ করতে পিছুপা হচ্ছেনা।

কুন্দেরপাড়ার পরিবর্তন প্রতিফলিত চরের শতভাগ নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন

---

২১ *প্রাসঙ্গিক তথ্য: এই সমীক্ষার সময়ে (২০০৯) জিইউকের সমিতির সদস্যদের সন্তানদের কলেজে পড়ার তথ্য জানা গিয়েছিল। পরে (২০১০)-এ জানা গিয়েছে এসব পরিবার থেকে অন্তুন ৩ (তিন) জন দেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার গৌরব অর্জন করেছে।*

ব্যবহারকারীর। শিশুমৃত্যুর হার, জন্মনিয়ন্ত্রন ইত্যাদি প্রবণতা এখন নিম্নসূচক। পক্ষান্তরে মা শিশু স্বাস্থ্য, টীকা গ্রহণের হার, জননিবন্ধন ইত্যাদির প্রবণতা উচ্চসূচক। চরের নিজস্ব চিকিৎসা ব্যবস্থা অপ্রতুল হলেও জরুরী স্বাস্থ্যগত অবস্থা মোকাবেলায় সক্ষম।

কুন্দেরপাড়া এখন নারী-অধিকার ও নারীর সক্ষমতার পথে প্রচেষ্টায় রত। নারীর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এলেও সামাজিক বাধা নারীর অগ্রযাত্রায় এখনো বাধাস্বরূপ। তবে আশার কথা এই যে, নারীরা এখন আগের চেয়ে অনেক বেশী সচেতন।

কুন্দেরপাড়ার নারী-পুরুষ এখন নিজেদের অবস্থান বিশ্লেষণে আগের চেয়ে অনেক বেশী সমর্থ। শুধু কি তাই, তারা নিজেরাই সক্ষম নিজেদের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায়, অভিনবত্বে আর সমস্যা সমাধানে।

কুন্দেরপাড়ার স্বকীয়তা

যমুনা-ব্রহ্মপুত্র নদীর বুকে জেগে ওঠা শত শত পুরনো-নতুন চরের মধ্যে ছোট একটি কুন্দেরপাড়া। এর নিজস্ব পরিচিতি হচ্ছে, এর অধিবাসীরা বন্যা ও নদীভাঙ্গনজনিত দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জন করেছে। প্রায় প্রতি বছরেই এই এলাকার জনগণ কোন না কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখোমুখি হয়ে থাকে। তবে এখন তারা অসহায়ের মত্যো এসব দুর্যোগের ক্ষতিকে নিয়তি হিসেবে মেনে নেয় না; তাদের সক্ষমতা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে সম্মিলিতভাবে এসব দুর্যোগের ঝুঁকি ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনতে সমর্থ হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, আশেপাশের অনেক চর বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হলেও কুন্দেরপাড়া চরটি এখনোবধি ভাঙ্গেনি।

কুন্দেরপাড়ার নিজস্বতার মধ্যে আরো রয়েছে এর অবকাঠামো –যা আশে-পাশের চরগুলোর তুলনায় অনেক উৎকৃষ্ট। চরের কেন্দ্রবিন্দুতে সুপরিসর বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র চরের প্রায় সকল পরিবারকেই আশ্রয় প্রদানে সক্ষম। এর স্কুল ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান এই চরের জনগণের জন্য অত্যন্ত সহায়ক ও প্রিয় –যা তাদের ভালবাসা আর শ্রমের ফসল। চরের জনগণ এগুলোকে তাদের নিজস্ব সম্পদ মনে করে রক্ষণাবেক্ষণ করে।

কুন্দেরপাড়ার আরেকটি বিশেষত্ব হচ্ছে এর সকল কার্যক্রম কমিউনিটিভিত্তিক পরিচালিত হয়। বন্যা, নদীভাঙ্গন, মঙ্গা এসব দুর্যোগ মোকাবেলায় সচেষ্ট ও সক্রিয় রয়েছে 'চর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি'। কমিটির অগ্রণী ভূমিকাই দুর্যোগ কবলিত গণ-মানুষের মধ্যে সকল ভেদাভেদ দূর করে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দায়িত্ববোধের বন্ধন সৃষ্টি করে। সমাজের একজন মানুষ হিসেবেই যেন কমিটির সাথে সম্পৃক্ত সদস্যরা দায়দায়িত্ব পালন করেন। বন্যা পূর্ববর্তী, বন্যাকালিন এবং বন্যা পরবর্তী কমিটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কারণে দুর্যোগের দুর্ভোগ অনেকটাই লাঘব হয়। দুর্যোগ পূর্বকালিন থেকেই থেকেই সজাগ থাকে কমিটিগুলো। তারা বন্যা, নদীভাঙ্গন, বৃষ্টিপাত এসবের তথ্য সংগ্রহ করে জনগণের মধ্যে প্রচার করে এবং নিজেদের প্রস্তুত রাখে। বন্যাকালিন কমিটির সদস্যরা অতিরিক্ত সচেতনতা অবলম্বন করে, বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা, কবলিত পরিবার ও

সহায়-সম্পদ উদ্ধারে আত্মনিয়োগ করে। কীভাবে জনগণ এই সময়ে সেবা পাবে সেসব বিষয়ে সরকার ও এনজিওদের নিকট সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করে থাকে। তবে সব কিছুই করে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে। এক্ষেত্রে কমিটির সদস্যদের বক্তব্য, আমরা নিজেদের জন্য কাজ করছি, চরবাসী আমরা সকলেই একে অপরের পরিপূরক। বিচ্ছিন্ন হয়ে চরে কোন উন্নয়ন সম্ভব নয়। কমিটিগুলো তাদের সভাগুলো নিয়মিত করে। জরুরী সময়ে সম্পৃক্ত করা হয় গ্রামের স্বেচ্ছাশ্রমী যুবকদের।

১৯৯৭ এর পর থেকে চরে যে সকল দুর্যোগ হয়েছে তাতে ক্ষয়ক্ষতিও হয়েছে তুলনামূলকভাবে অনেক কম। গণ উন্নয়ন কেন্দ্র দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে তাদের কাজ ও দায়দায়িত্ব এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করার পাশাপাশি সমগ্র-গ্রামের সকল বয়স্ক নারী-পুরুষ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে দুর্যোগ বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টি করেছে। এখন চরাঞ্চলের লোকজন দুর্যোগ পূর্ব-প্রস্তুতিকেই বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এজন্য দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতির শিকারও কম হতে হয়।

সমীক্ষার জন্য তথ্য সংগ্রহ করা হয় বিভিন্ন পর্যায় থেকে। (বামে) কুন্দেরপাড়ার গণ-প্রতিনিধি, কেন্দ্র পরিচালনা কমিটি, ও উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের সাথে লেখক ও গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের কর্মকর্তাবৃন্দ

(ডানে) কুন্দেরপাড়ার নারী সমিতির সদস্যদের সাথে এফজিডি

অধ্যায়-৭

অনুধাবন ও প্রত্যাশা

কিছু প্রতিবন্ধকতা

চরের জীবন-যাত্রার পরিবর্তন, দুর্যোগ প্রশমন ও উন্নয়ন কোন কিছুই মসৃণ কিংবা কন্টকহীন ছিল না, বরঞ্চ প্রতিটি ধাপেই এর অনুঘটকদের অতিক্রম করতে হয়েছে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা এবং চ্যালেঞ্জ। শুরু থেকেই কুন্দেরপাড়ার উন্নয়নে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত জিইউকের কর্মীদের পক্ষ থেকে আঞ্জুম নাহিদ চৌধুরী *(বর্তমানে সমন্বয়কারী-কর্মসূচি)*, মোঃ মহিরুল ইসলাম তুষার *(বর্তমানে কর্মসূচি ব্যবস্থাপক)* এবং আরো অনেকে জানান, বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র করতে গিয়ে তারা অনেকেরই বিরাগভাজন হয়েছেন। দরিদ্র নারী-পুরুষের কর্মসংস্থানের জন্য কুন্দেরপাড়া বন্যা আশ্রয় কেন্দ্রের মাটিকাটার কাজে সম্পৃক্ত করা নারীদেরকে কাজ থেকে বাদ না দিলে কাজ বন্ধ করে দেবার হুমকি দেয়া হয় বিভিন্ন মহল থেকে। এই কাজে অংশগ্রহণকারী আশেপাশের গ্রামের প্রায় চারশত নারী-পুরুষদের বিভিন্নভাবে বিভক্ত করার চেষ্টা করা হতো। জিইউকে ও চরবাসী এটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করে। একপর্যায়ে সাম্প্রদায়িক-মনষ্ক মাতব্বর শ্রেণীর একটি দলের সাথে জিইউকের কর্মীদের বৈঠকে কিছু শর্তে ছাড় দেবার মাধ্যমে একটা সমাঝোতা হয়। এসব শর্তের মধ্যে ছিল: ১. নারীরা কোদাল দিয়ে মাটি কাটতে পারবে না, ২. মাটির বোঝা নারীরা মাথায় নিতে পারবে না। এছাড়া সমান মজুরী বিষয়ে কিছুটা আপত্তি ছিল। জিইউকে প্রথম দুটি শর্ত মেনে নিয়ে সমান মজুরীর ক্ষেত্রে অটল থাকে ও তাতে সক্ষম হয়।[২২] মজিদ আকন্দ বলেন, বাড়ির বৌ-ঝিদের যেন গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের সদস্য হতে না দেই সে জন্য আমাকে অনেকবার ভয় দেখানো হয়েছে। তবে আজ ঐসব ভীতি প্রদর্শনকারীদের কোন পাত্তা নেই।

লাভলী, মর্জিনা, জহুরা এরা সবাই একটা শ্রেণীর কাছে নিগৃহীত হয়েছিল যখন তারা সমিতির সদস্য হয়েছিল। তাদের বেহায়া বেপর্দা বলে গালাগাল করেছে, একঘরে করে রাখার ভয় দেখিয়েছে। পিঞ্জিরার বিশ্লেষণ, "*বইন্নার সময়ত যামরা হামাক জাগা দেয় নাই তামরাই সেই সময়ত চিল্লা হাল্লা করছিল বেশি। হামারগুলার মত গরীব মাইনসেরদুই বেলা খায়য়া বাইচবার চায় এ্যাইগলা ওমার মনত খায় না। ওমার চরের*

২২ *'জিইউকে ও জেন্ডার ধারণা' শীর্ষক নিবন্ধ (পূর্ব প্রকাশিত)।*

সউগটায় খাবার চায়। [বন্যার সময়ে যারা আশ্রয় দেয়নি তারাই তখন বাধা সৃষ্টি করতো। আমাদের মতো গরীব মানুষ দু-মুঠো খেয়ে পড়ে বাঁচতে চায় এটা ওদের পছন্দ নয়। ওদের পুরো চরটির দখলই যেন চাই।]"

বিগত পনের বছরে ছোট্ট চরটির অধিবাসী ক্রমাগত বেড়ে যাওয়াকে চ্যালেঞ্জ মনে করেছেন অনেকে। কারণ পরিবার সংখ্যা বেশী হলে চরের অবকাঠামো ও সামর্থের তুলনায় তা অপ্রতুল হবে। সেক্ষেত্রে চরটি ঝুঁকির মধ্যে পড়তে পারে।

চরের বিরাজমান ও উদ্ভূত অনেক সমস্যা সম্পর্কে চরের পরিচালনা পর্ষদসহ চরবাসী অনেকেই ওয়াকিবহাল। চরের মানুষের এখনো সারা বছর করার মতো কাজের ব্যবস্থা নেই। স্থানীয়ভাবে বীজ উৎপাদনে এখনও চাহিদা অনুযায়ী সক্ষম নয়, অর্থ নিয়ন্ত্রণে নারীদের অংশগ্রহণ এখনও সীমিত। চরে কমিউনিটিভিত্তিক অনেকগুলো সামাজিক প্রতিষ্ঠান থাকলেও এগুলোর ব্যয়নির্বাহ করা সম্ভব এরকম কোন নিশ্চিত ও নিয়মিত আয়ের উৎস নেই। এগুলো এখন চরের কর্তৃস্থানীয়দের ভাবনা।

চরে লক্ষনীয় নেতিবাচক বিষয়ের মধ্যে '*যৌতুক সমস্যা*' অন্যতম। চরের নারীসমাজের মধ্যে এ বিষয়ে বেশী উদ্বেগ লক্ষ করা গেছে। বিভিন্ন সাক্ষাৎকার ও দলীয় আলোচনায় বেশ উচ্চস্বরেই তারা উদ্বেগটি প্রকাশ করেছে। তবে বিষয়টি এরকম নয় যে, তারা যৌতুক সম্পর্কে সচেতন নয়। যৌতুকের কুফল ও পরিণতি, এমনকি যৌতুক বিষয়ক আইন সম্পর্কেও তাদের অবগতি সন্তোষজনক মানের মনে হয়েছে। কিন্তু তারপরেও যৌতুকের মতো বড় সামাজিক ব্যাধি এখনো ঘাড়ের উপর চেপে বসে আছে। এ থেকে নিষ্কৃতি পাবার উপায় নেই যেন। তেপান্তর মহিলা সমিতির সদস্য জরিফুল বেগম প্রস্তাব রাখেন, সমিতির সদস্যদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক ও বিবাহ হলে যৌতুক হয়তো বন্ধ করা যাবে। সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে না হলেও কেউ উড়িয়ে দেননি তার প্রস্তাব। তবে সকলেই একমত যে, এই সমস্যার সমাধান করতে হবে। এটা তাদের পক্ষে হয়তো কোন একদিন সম্ভব হবে –এটা তাদের সবার বিশ্বাস। কিন্তু কীভাবে সম্ভব? এ প্রশ্নের সদুত্তর কেউ দিতে পারেনি।

চরবাসীর জন্য প্রাকৃতিক-দুর্যোগ যে সকল সমস্যা তৈরী করেছে তার মধ্যে '*মনোঃসামাজিক সমস্যা*' অন্যতম এবং এটা প্রভাবদায়ীও। বন্যা ও নদীভাঙন কবলিত চরবাসীর সহায়সম্বল ক্ষতিগ্রস্ত হলে তারা অনেকেই মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তারা স্বীকার করেছে – এই কারণে তাদের অনেকেই মনোবল হারিয়েছিল যে তারা হয়তো আর কোনদিন স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারবে না। উদ্বাস্তু-ভবঘুরের মতো, ভিখারীর মতো জীবনই হয়তো তাদের নিয়তি। তারা ঘুরে দাঁড়িয়েছে, কারণ তাদের জন্য গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের ধারাবাহিক উন্নয়ন প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল। এটা সত্য যে, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অবস্থার উন্নয়নের জন্য তরুণ বা যুব বয়সের শক্তি, অর্জিত সম্পদের সদ্ব্যবহার, জীবন-যাত্রার ধারাবাহিকতা ইত্যাদি ক্রমাগত প্রচেষ্টা বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে। কিন্তু কোন দুর্যোগ-দুর্ঘটনায় ব্যাপক ক্ষতির সম্মূখীন হবার পর তাদের মনোবল ভেঙ্গে যায়। তখন তারা লক্ষ্যচ্যুত হয় এবং অবস্থা থেকে উত্তোরণের সাহস হারিয়ে ফেলে। এর প্রভাব পড়ে তাদের পরবর্তী জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং তা তাদের জন্য

গৃহীত উন্নয়ন উদ্যোগকে প্রলম্বিতও করতে পারে। কুন্দেরপাড়াসহ বন্যা ও নদীভাঙ্গন কবলিত সকল চরবাসীর জন্যই এই সাধারণ সত্যটা প্রযোজ্য – যা বিভিন্নভাবে উঠে এসেছে তাদের বিভিন্ন কথা, দৃষ্টিভঙ্গী ও আচরণে।

উত্তোরণ ভাবনা

দুর্যোগের মাধ্যমে সৃষ্ট '*মনোঃসামাজিক সমস্যা*' বিরাজমান থাকলে তার প্রতিকারের দিকটা ভাবা জরুরী। এই অবস্থার উত্তোরণে প্রাকৃতিক-দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, ক্ষয়ক্ষতির প্রশমন এবং পুনর্বাসন কার্যক্রমের মধ্যে অন্যান্য প্রচেষ্টাগুলোর সাথে মনোঃসামাজিক সেবা যোগ করা দরকার। উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে এই সেবা সম্পূরক হবে– এটা অনুমান করা যায়। সামাজিকভাবে সৃষ্ট '*যৌতুকের আধিক্য*' এ পর্যন্ত অর্জিত বিভিন্ন সাফল্য ধরে রাখার জন্য হুমকিস্বরূপ। যৌতুক সম্পর্কে সচেতন হবার পরেও যৌতুক প্রবণতা বৃদ্ধির কারণ কৌতূহলপ্রদ। '*মনোঃসামাজিক সমস্যা*' এবং 'সচেতন হবার পরেও *যৌতুকের আধিক্য*' ইস্যু দুটি বিস্তৃত গবেষণার দাবী রাখে। এই বিষয়গুলোসহ নিত্যনতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করাই অনুঘটকদের পরবর্তী কৌশল হতে পারে।

চরের এক নারী তহিমন বিবি মনে করেন, সমিতির সদস্য হওয়াকে এখন আর কেউ খারাপ মনে করে না: "*চরত ঐইগলা দিন এখনত আর নাই যে সমিতির সদস্য হওয়াক খারাপ মনে করবি। এর প্রমাণ তো হাতত হাতত। হামরা কোটে আছিনু আর এ্যালা হামরা কতত ভাল আছি।*" বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের সভাপতি নুরুন্নবী সরকার মনে করেন, চরের একটি নিজস্ব আয়মূলক উৎস থাকতে পারে যার মাধ্যমে আশ্রয়কেন্দ্র, স্কুল, নৌকাসহ অন্যান্য সম্পদ ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে সচল রাখবে।

গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রধান নির্বাহী এম আব্দুস সালাম মনে করেন, চরের জনগণ বিশেষ করে নারীদের জন্য সারা বছর উপার্জন ও কাজের ব্যবস্থা থাকাটা সত্যিই জরুরী। স্থানীয়ভাবে বীজ উৎপাদনে চরবাসীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রচেষ্টা হাতে নেয়া দরকার। যৌতুকের বিষয়টি এখনো নিয়ন্ত্রণে না আসার কারণ আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজের মানসিকতা –যা এখনো বিদ্যমান আইনকে থোড়াই কেয়ার করে। এসব বিষয়ে সকল স্তরে আরো জনসচেতনতা সৃষ্টিসহ প্রশাসনকে আরো তৎপর হওয়া দরকার। যৌতুক নেয়া ও দেয়া আইনগত অপরাধ হলেও এর কারণে ক'জনইবা শাস্তি পেয়েছে। এরকম কিছু দৃষ্টান্ত না থাকাটাও যৌতুক নিরোধ বিলম্বিত হচ্ছে।

সামাজিক কু-সংস্কার, গোড়ামী, বাল্যবিবাহ, যৌতুক ইত্যাদি হ্রাসে আরো পদক্ষেপ নেয়া দরকার। একইসাথে সাম্প্রদায়িকতা, সুবিধাবাদী শ্রেণী, দালাল, ফড়িয়া ও পাচারকারী-এদের সম্পর্কে আরো সচেতন করার পাশাপাশি তাদেরকে এড়িয়ে উন্নয়নের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় যোগসূত্র স্থাপন করা জরুরী।

চরের জনগণের মধ্যে বিভিন্ন অকৃষি ও কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্র শিল্প ও কুটির শিল্পের প্রসার ঘটানো জরুরী। কারণ একটা সময় চরের নিজস্ব উৎপাদন দিয়ে চরবাসীর অন্ন সংস্থান সম্ভব হবে না। তাছাড়া মৎস, গবাদি-পশু পাখি পালন ইত্যাদির দিকে মনোযোগ দেয়া

যেতে পারে। আধুনিক তথ্য ও প্রযুক্তিভিত্তিক সচেতনতার মাধ্যমে মূলভূমির প্রতি চরের নির্ভরশীলতা কমাতে হবে। বিপণন ও বানিজ্যে স্থানীয় গুরুত্ব বৃদ্ধি করতে হবে। চরে পল্লীভিত্তিক কুটিরশিল্প-উদ্যোক্তা শ্রেণী (জামালপুরের সূচিকর্মের কারিগর পল্লীর অনুকরণে) গড়ে তোলা যেতে পারে।

চরবাসীকে ভবিষ্যৎ আয় ও কর্মসংস্থানের জন্য প্রতিযোগিতামূলক যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন করতে হবে। তাছাড়া চরবাসীর মধ্যে স্থানীয়ভিত্তিক আয়-মূলক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে –যার বিনিময়ে এসব প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা সম্ভব হবে।

তবে সকলের অভিমত এই যে, এসব সমস্যা গুরুত্বপূর্ণ হলেও এতটা বড় নয় যে অতিক্রম করা সম্ভব হবে না। কারণ কুন্দেরপাড়ার বিবর্তনে ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০৯ পর্যন্ত এত বড় পরিবর্তনকে তারা সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় সম্ভবপর করেছে। তবে চর যা'তে কোনভাবেই অধিক বসতির ঝুঁকির মধ্যে না পড়ে সেদিকে চরবাসীর মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টিসহ বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিয়ে পরিকল্পনায় নিয়ে আসা দরকার।

স্থায়িত্বশীলতার প্রশ্নে কিছুক্ষণ

১৯৯৫ থেকে ২০০৯; পনের বছরের একটা খণ্ডচিত্র। খুব কি দীর্ঘ সময় ছিল এটা?

১৭৮৭ থেকে ১৯৯৫ যদি কালজ পর্ব হয় তবে কুন্দেরপাড়ার জন্য ১৯৯৫ থেকে ২০০৯ হবে কালোত্তর পর্ব। চরের জনগণের যে বিপর্যস্থ ও বিধ্বস্ত চিত্র আমরা দেখেছি তা ছিল দীর্ঘ দু'শ বছরেরও বেশী সময়ব্যাপী দুর্যোগ ও দারিদ্র্যের সাথে সংগ্রাম করে বংশ পরম্পরায় টিকে থাকা একটি জনপদের চিত্র। এই দীর্ঘ সময়ে সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অবহেলিত চর জনপদের বিপদাপন্নতা অতিক্রম করতে কেউ এগিয়ে আসেনি। এতদিনে সমস্যা সমাধান করে অনেকটা পরিপাটি, সুশৃঙ্খল সচেতন জনপদ উপহার দেবার জন্য পনের বছর যে খুব বেশী সময় নয়-এটা অনুধাবনযোগ্য। অবশ্য এই পুরো সময়টায় বরাদ্দ করতে হয়েছে অনেক ত্যাগ, শ্রম আর প্রচেষ্টা। এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করা যায় যে, গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের কর্মসূচিতে কুন্দেরপাড়াসহ আরো অনেকগুলো চরের উন্নয়ন প্রচেষ্টা বিদ্যমান সমান্তরালভাবে। কুন্দেরপাড়ার পনের বছরের পরিবর্তনগুলো চরবাসী ও এর অনুঘটকদের চোখের সামনে এখন দেদীপ্যমান। দু'শ বাইশ বছরে যা হয়নি, বিগত পনের বছরে তাই হয়েছে। সাধারণ চরজীবনের মতো কুন্দেরপাড়াকে জন্মের পর দীর্ঘদিন ভুগতে হয়নি সমস্যার বেড়াজালে। কারণ এর পরিচর্যায় ছিল গণ উন্নয়ন কেন্দ্র –যার প্রতিশ্রুতি ছিল চরের অবহেলিত জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন। আজকের কুন্দেরপাড়াকে পূর্বের সময়ের সাথে মিলিয়ে দেখা তাই গুরুত্বপূর্ণ।

পনের বছর পর যে কুন্দেরপাড়াকে আমরা পেলাম তাতে আমরা কতটুকু সন্তুষ্ট? এটা যদি আমাদের ইঙ্গিত প্রশ্ন হয়, তবে এর জবাব পাবার আগে আমাদের খুঁজতে হবে আরো দুটি প্রশ্নের উত্তর। আর তা হচ্ছে:

এক, কুন্দেরপাড়ার পরিবর্তনের জন্য যে সকল পদ্ধতি বা উপায়-এর প্রয়োগ ঘটানো হয়েছে তা কতটুকু লাগসই বা উপযুক্ত ছিল?

দুই, এই প্রচেষ্টায় যে সকল বিনিয়োগ বা ইনপুট হয়েছে সে তুলনায় প্রাপ্তি কি যথাযথ হয়েছে?

সরাসরি কোন রেটিং স্কেল ব্যবহার না করায় এবং এই সমীক্ষা থেকে আমরা উপরোক্ত প্রশ্নদ্বয়ের যথাযোগ্য উত্তর পেতে পারি না, বরং তা নতুন কোন গবেষণার বিষয় হতে পারে। তবে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা, উদাহরণ ও মন্তব্য থেকে যা প্রতীয়মান হয়েছে তা হচ্ছে, কুন্দেরপাড়ার উন্নয়নে এমন কোন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়নি যা বাইরে থেকে আমদানী করা বা চাপিয়ে দেয়া। অনুঘটকদের মূল উদ্দেশ্য ছিল গ্রামের জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সমস্যা দূরীকরণ ও সমাধানের স্থায়িত্বশীলতা। এখানে উপকারভোগী নিজেই পরিবর্তনের অনুঘটক। প্রয়োগ পদ্ধতিগুলো মূলত তাদের ভেতরকার সুপ্ত সম্ভাবনার প্রকাশ। অনুঘটক সংস্থা এই সম্ভাবনাগুলোকেই নিবিড় ও সুষ্ঠুরূপে প্রকাশের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছে –এরকমই বুঝা যাচ্ছে। আর এজন্যই উপকারভোগীদের নিকট কাজটা কখনোই অসহনীয় বা অসম্ভব মনে হয়নি, বরং স্বল্প-সময়ে নিরবে বড় ধরনের মৌলিক পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হয়েছে। বিভিন্ন সাক্ষাৎকার ও এফজিডি বা পর্যবেক্ষণ থেকে যে প্রতিউত্তরটি বার বার এসেছে তা হচ্ছে– কুন্দেরপাড়াবাসী মনে করে, এসব কার্যক্রমে তাদের অন্তরের ভেতরকার লালিত স্বপ্নকেই বাস্তবায়িত করা হয়েছে। তাদের আত্মবিশ্বাস, এই উন্নয়ন স্থায়িত্বশীল হবে বা হতেই হবে।

বিনিয়োগ বা ইনপুট এর তুলনায় প্রাপ্তির প্রশ্নে পরোক্ষ যে মানদণ্ড ব্যবহার করা যায় তা হচ্ছে, চরের ভেতরের ও বাইরের জনগণের কাছে এসব ইনপুটের গ্রহণযোগ্যতা বা রেপ্লিকেশন -যা অত্যন্ত প্রতিকূল একটা পরিবেশ-পরিস্থিতির মধ্যেও দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে।

অবশ্য, আরো একটি প্রপঞ্চকে (phenomenal reality) এখানে দাঁড় করানো যায়; তা হচ্ছে, চর প্রকৃতির সৃষ্টি এবং নদীর গতি প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। বর্তমান জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাবে নদীর প্রবাহের ক্ষীণতা চরে যেমন রুক্ষ প্রকৃতি নিয়ে আসতে পারে আবার হঠাৎ অতি বন্যায় বা অতি বর্ষণে ভাঙ্গন-বিপর্যয়ও ঘটাতে পারে। সেক্ষেত্রে এই উন্নয়নের স্থায়িত্বশীলতা পরিমাপিত হবে কীভাবে?

এই কৌতূহলকে নিবৃত্ত করতে আশাকরি যে বাস্তবতাকে ধারণ করতে পারি তা হচ্ছে 'মানব-উন্নয়ন' এবং এর সুফলতা। প্রকৃত পক্ষে চরবাসীর নিজস্ব উন্নয়ন তথা দক্ষতা, জ্ঞান, শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, উন্নতির ধারা ইত্যাদি আর্থ-সামাজিক যতটুকু ঘটেছে তা স্বাভাবিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবার বা ভুলে যাবার সম্ভাবনা আর নেই। বরঞ্চ বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তির প্রভাবে তাদের এই সব শিক্ষা আরো শাণিত হচ্ছে; একই পর্যায়ের অন্যদের থেকে তারা দ্রুত অনুধাবন করতে পারছে। তারা নিজেরাই এখন সচেতন এবং নিজেদেরকে পরিচালনা করতে ও এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম। সেইসাথে তারা নিজেদের সন্তানসন্ততিদেরকে অপেক্ষাকৃত উন্নত জীবনের সন্ধান দিতে পারছে। আজ তাদের

অনেকের সন্তানই কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে– যা তাদের কাছে একসময়ে ছিল কল্পনাতীত। আশা করা যায় এভাবেই উন্নয়ন ঘটবে প্রজন্মের, এলাকার এবং দেশের। জিইউকে এবং এর উন্নয়ন অংশীদারদের এটাই লক্ষ্য ছিল এবং এ লক্ষ্যের অনেকটাই অর্জিত হয়েছে বিগত পনের বছরে।

কুন্দেরপাড়ার ভবিষ্যৎ

এটা সত্য যে, সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থায় একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনশীলতা বিরাজ করছে। এই পরিবর্তনশীলতার প্রভাব বাংলাদেশের পল্লী প্রকৃতি ও সামাজিক কাঠামোতেও সুস্পষ্ট লক্ষণীয়। বিশেষ করে, কৃষি জমির স্বল্পতা, নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রীর উৎস হিসেবে শিল্প-পণ্যের আগ্রাসন, তথ্য-যোগাযোগ ও অন্যান্য প্রযুক্তির প্রসার ইত্যাদি কারণে গ্রাম তার কৌলিন্য স্বভাব থেকে ক্রমশই বের হয়ে আসতে শুরু করেছে। এমতবস্থায় বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়নের রীতি-নীতির ক্ষেত্রেও অবশ্য যুগোপযোগী চিন্তা-ভাবনার সমন্বয় ঘটানো দরকার। বাংলাদেশে বিগত অর্ধশত বছর যাবত 'স্বনির্ভর গ্রাম' ধারণাটি প্রচলিত হলেও গ্রাম ও শহরের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভশীলতা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে– একথা স্বীকার্য। তাই কোন গ্রামের এককভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়াটা আধুনিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে তাৎপর্যপূর্ণ নয়, বরঞ্চ গ্রামের মানুষের উন্নত জীবন-যাপনের প্রশ্নটা ক্রমশই মুখ্য হয়ে উঠেছে। তবে গ্রামের সত্তাকে অস্বীকার করেও উন্নয়ন সম্ভব নয়। এখনো গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসীর জন্য নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করার বিষয়টিও অগ্রগণ্য।

এসকল বিষয় বিবেচনা করে কুন্দেরপাড়ার মতো একটি নিভৃত পল্লীগ্রামের ভবিষ্যত চিন্তা করা দরকার। পরিবর্তশীলতার এই সময়ে গ্রামীণ লালিত্যের সংরক্ষণ কঠোর বাস্তবতার মুখোমুখি। অন্যদিকে শহরে আধুনিক নাগরিক সৌকর্যের সাথে নাগরিক সমস্যাগুলোও সমভাবে বিরাজমান। বর্তমানকালের গ্রামে আধুনিকতার সুবিধা যতটা তার চেয়ে সমস্যা-ই বেশি লক্ষণীয়। এই পরিবর্তনের ধাপগুলো গ্রামকে দ্বান্দ্বিক-শঙ্কায় নিয়ে যাচ্ছে। ঢেঁকির শব্দ গ্রামের অন্তকরণ আবেগ হলেও শ্যালো ইঞ্জিনের শব্দই অর্থনৈতিক পরিবর্তশীলতা – যা ক্রমশই গ্রামবাসীর চাহিদার সাথে সমর্পিত। তাই কুন্দেরপাড়ার ভবিষ্যত বাংলাদেশের অন্যান্য গ্রামের চেয়ে পৃথক কোন পন্থা অবলম্বন করবে -এরকম কোন ইঙ্গিত বহন করে না।

কুন্দেরপাড়া গ্রামের যতটুকু ভাল তা ধরে রাখাই এখন এই গ্রামের জন্য করণীয় হলে ভাল হবে। মানুষের মনের আলো জ্বালাতে শিক্ষার প্রসার ও প্রয়োগ এক্ষেত্রে ফলদায়ক হবে। গ্রামকেন্দ্রিক গড়ে ওঠা বিভিন্ন অপসংস্কৃতি, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অপ-তৎপরতা, শ্রেণীবিশেষের শোষণ, অন্যায্যতা ইত্যাদির বিপরীতে গ্রামবাসীকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হলে তাদের ঐক্য ও সংহতি, নিরলস প্রচেষ্টা, শিক্ষা ও সংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের যথেষ্টতা, সামাজিক বন্ধন, রাজনৈতিক সচেতনতা ইত্যাদির উন্নয়ন একান্ত দরকার।

উপসংহার

স্বাধীনতাউত্তর বাংলাদেশে ব্রহ্মপুত্র-যমুনাসহ বিভিন্ন নদীর বুকে জেগে ওঠা অনেকগুলো চর ধীরে ধীরে পরিপূর্ণ মানববসতি তথা গ্রাম হিসেবে মর্যাদাপ্রাপ্ত হয়েছে। কুন্দেরপাড়া এর মধ্যে একটি। অন্য দশটি চরের সাথে এর পার্থক্য হলো শুরু থেকেই এই চরে নেয়া হয় কিছু কাঙ্ক্ষিত পরিকল্পনা, যার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হচ্ছে– বন্যাজনিত দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবেলায় সক্ষম একটি জনগোষ্ঠী ও অবকাঠামোসম্পন্ন গ্রাম –যার জনগণ নিজেরাই নিজেদের উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হবে। এই উদ্যোগ গ্রহণের প্রায় পনের বছর পর ঐ চর তথা কুন্দেরপাড়া গ্রামটি সম্পর্কে জানার যে স্বাভাবিক কৌতূহল জেগে ওঠে '*কুন্দেরপাড়া: নিসর্গ ও অন্তর*' তা নিবৃত্ত করার প্রয়াস মাত্র। অবশ্য কোন ধারাবাহিক প্রকল্প বাস্তবায়নের শুরুর সময় থেকে পনের বছর পর কোন পরিবর্তন বা প্রভাব দেখা দিলে তাতে অবশ্যই সত্যিকার চিত্রটি ফুটে উঠতে থাকে; এমনকি তাতে স্থায়িত্বশীলতার প্রমাণও অনেকটাই মেলে।

কুন্দেরপাড়ার দিকে তাকালে এখন আমরা আসলে কি দেখতে পাই, কিংবা এই দেখা আমাদের অন্তকরণে কি ছবি আঁকে? সব মিলিয়ে এর প্রতিফলন পরিদৃষ্ট হয় কিছু গুচ্ছ প্রতিবিম্বে। যেমন- একদিকে ভয়াবহ প্রকৃতি, অন্যদিকে আশা জাগানিয়া কিছু চোখ; একদিকে দু'শো বছরের সমাজ ও রাষ্ট্র দ্বারা অবহেলিত চরবাসী, অন্যদিকে পনের বছরের কর্মোদ্দীপ্ত প্রচেষ্টা; একদিকে প্রতিনিয়ত বিরুদ্ধচারণে প্রতিক্রিয়াশীল সমাজের ক্ষতিকর প্রভাব অন্যদিকে রুগ্ন-শুষ্ক গুটিকতক দুর্বল হাতের ঐক্য। অবশেষে তাদেরই জয় হলো –যাদের ব্যথিত বুকে পা ফেলে কুন্দেরপাড়ায় নব উত্থান ঘটেছে। কুন্দেরপাড়া দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমনসহ বহুদিক থেকে সক্ষমতা অর্জন, শিক্ষা ও সচেতনতায় অন্যান্য অবহেলিত চরগুলো অপেক্ষা স্বতন্ত্র ও উৎকৃষ্টতা অর্জন করেছে। এলাকাবাসী তাই কখনো কুন্দেরপাড়াকে আদর করে বলে 'চরের রাজধানী'। 'কুন্দেরপাড়ায় পড়ি' বা কুন্দেরপাড়ায় থাকি– এ পুলক নিয়ে এখানকার শিক্ষার্থী ও অধিবাসীরা গর্ব বোধ করে।

এখন কুন্দেরপাড়ার সেই ভয়াবহতা দেখা যায় না। নিত্যকার চিত্র হলো– শিশুরা হল্লা করে স্কুল থেকে ফিরছে, সৌর বিদ্যুতে আলোকিত ছাত্র-ছাত্রী নিবাসে সুর

করে রাতের পড়া তৈরী করছে, বিদেশি-দেশি অনেকই আসছে-যাচ্ছে। চরের বাইরের কিংবা শহরের অনেকেই কুন্দেরপাড়াকে একটু ঘুরে আসার জন্য সুন্দর জায়গা হিসেবে বেছে নিয়ে থাকে। অনেকেই মনে করছেন, কুন্দেরপাড়ায় একটা পিকনিক স্পট হতে পারে। কুন্দেরপাড়ার অধিবাসীরা আশেপাশের চরগুলোর অধিবাসীদের তুলনায় নিজেদেরকে সম্মানিত মনে করছে। একই সাথে তার কৃতিত্ব দিচ্ছে মূল অনুঘটক গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (জিইউকে)কে। এরা সবাই কুন্দেরপাড়া গ্রামের অর্জিত সুনামকে অক্ষুণ্ন রাখতে বদ্ধপরিকর।

কিন্তু কোন অর্জনই চূড়ান্ত নয়। কারণ, এ তো মাত্র শুরু। এর শেষ বলবে কে? কারণ কুন্দেরপাড়া প্রতি দশকেই ভিন্ন ভিন্ন রূপ আর শক্তি নিয়ে বাংলাদেশের কোন অভিন্ন জনপদের প্রতিমূর্তি হিসেবে আবির্ভূতই শুধু হবে না, আরো কি হবে সে বিষয়ে ভবিষ্যৎবাণী করা যাচ্ছে না।

এক নজরে কুন্দেরপাড়া

কুন্দেরপাড়ার জন্ম	: ১৯৮৭-৮৮
বসতি শুরু	: ১৯৮৮
জিইউকে-অক্সফাম এর কাজ শুরু	: ১৯৯১
জিইউকে'র বন্যা পুনর্বাসন কার্যক্রম শুরু	: ১৯৯৫
সমন্বিত দুর্যোগ প্রস্তুতি ও চর উন্নয়ন কর্মসূচি শুরু	: ১৯৯৭

অবস্থান: গাইবান্ধা জেলা শহর সীমান্ত থেকে ১৬ কিলোমিটার পূর্বে যমুনা-ব্রহ্মপুত্র মিথুনে সৃষ্টি নদীর চরে সদর উপজেলার কামারজানি ইউনিয়নের অর্ন্তগত কুন্দেরপাড়া গ্রাম। এর পূর্বে মোল্লারচর ইউনিয়ন, দক্ষিণে ফুলছড়ি উপজেলার এরেন্ডাবাড়ী ও ফজলুপুর ইউনিয়ন, পশ্চিমে গাইবান্ধা সদরের গিদারী ইউনিয়ন এবং উত্তরে সুন্দরগঞ্জ উপজেলার কাপাসিয়া ইউনিয়ন। পূর্ব বাটিকামারী গ্রাম সীমানা হিসেবে কুন্দেরপাড়ার পশ্চিম, উত্তর ও উত্তরপূর্ব দিক। এর বাইরে পূর্বদিকে পারদিয়ারা, দক্ষিণ ও দক্ষিণে খারজানী, দক্ষিণ-পশ্চিমে ফুলছড়ি উপজেলার কঞ্চিপাড়া গ্রামের সীমান্ত। চরের পশ্চিম পার্শে উত্তর-দক্ষিণ বরাবর প্রতিবছরই কমবেশী যমুনা-ব্রহ্মপুত্রের ভাঙনের শিকার হয়।

আয়তন: মূল চরের আয়তন প্রায় দেড় বর্গ কিলোমিটার, দৈর্ঘ্য প্রায় ১৫০০ মিটার, প্রস্থ প্রায় ১০০০ মিটার। আবাদী জমির পরিমাণ ৩০০ বিঘা, অনাবাদী জমি ১০১ বিঘা। তবে বর্ষায় পলিসিঞ্চন ও নদীভাঙনের তারতম্যের উপর এই সীমার কিছুটা পরিবর্তন ঘটে।

যোগাযোগ: বর্ষাকালে বড় নৌকায়, শুষ্ক মৌসুমের কয়েক মাস এর পার্শ্ববর্তী গ্রাম পূর্ব বাটিকামারী ও পারদিয়ারা থেকে ছোট নৌকায় যাতায়াত করা যায়, বর্ষায় শুকনো কোন রাস্তা থাকে না।

অধিবাসী: মোট পরিবার সংখ্যা ৩১৪। জনসংখ্যা ১২৯৪ জন (ঘনত্ব বঃ কিঃ ৮৬৩ জন)। নারী ৬৪০, পুরুষ ৬৫৪। মেয়ে শিশু ১৬৯ ও ছেলে শিশু ১৩৯। ১৯৯২ সালের ভোটার ছিল ৫১৪ জন, বর্তমানে প্রায় নয় শত।

অবকাঠামো ও সম্পদ: ১টি উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১টি বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১টি ছাত্র ও ছাত্রীনিবাস, অনেকগুলো টিনের তাবু সম্বলিত উঁচু ও প্রশস্ত বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র, ১টি মসজিদ ও ছোট ১টি বাজার, ইঞ্জিনচালিত নৌকা, স্পীড বোট, ১টি ভাসমান এ্যাম্বুলেন্স, সৌরবিদ্যুৎ প্লান্ট, জরুরী মজুদাগার ও কবরস্থান আছে। অধিবাসীদের সম্পদের মধ্যে রয়েছে গরু ৪৮৮টি, ছাগল ১৭৪টি, হাঁস ২০৫টি, মুরগী ৪৭০টি, নলকূপ ২৬৪টি, ল্যাট্রিন ২৬৪টি, উঁচু করা বসতভিটা ২৮১টি এবং নিচু বসতভিটা ৩১টি। (২০০৯ সালের তথ্য)

পেশা ও কৃষি-উৎপাদন: পেশা- দিনমজুর, মৎস্যজীবী ও কৃষিজীবী। প্রধান ফসল পাট, কাউন, চিনা, ধান, ভুট্টা, মরিচ, গম, তিসি শাক-সবজি আর মিষ্টি আলু। তবে চরের অধিকাংশ বাসিন্দাই ভূমিহীন এবং বসবাসরত পরিবারগুলোর মধ্যে শতকরা ৮৫ ভাগই অতিদরিদ্র এবং দরিদ্র।

কুন্দেরপাড়ার নিজস্ব ভাসমান এ্যাম্বুলেন্স ও জরুরী চিকিৎসাকেন্দ্র

আলোকচিত্রে
কুন্দেরপাড়া

ভোর হতেই শুরু হয় জীবিকা সংগ্রহের তাগিদ

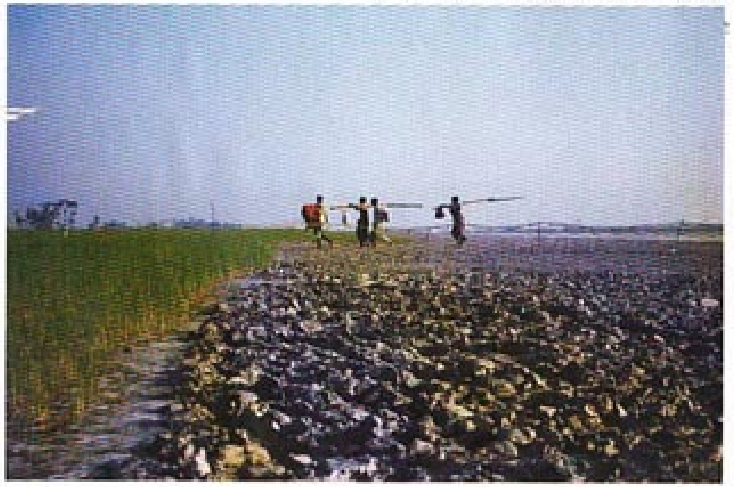

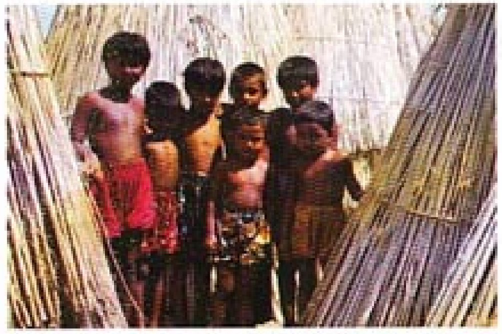

কুন্দেরপাড়ার শৈশব

কুন্দেরপাড়ার শিশুরা নদী-প্রকৃতির কোলে বেড়ে ওঠা সন্তান। দুরন্তপনা ওদের মজ্জাগত। খেলার অনেক উপকরণ নিজেরাই বানিয়ে নেয়। কাঁশবনে লুকোচুরি আর নল খাগড়া আস্বাদন দুটোই চলে সমানভাবে।

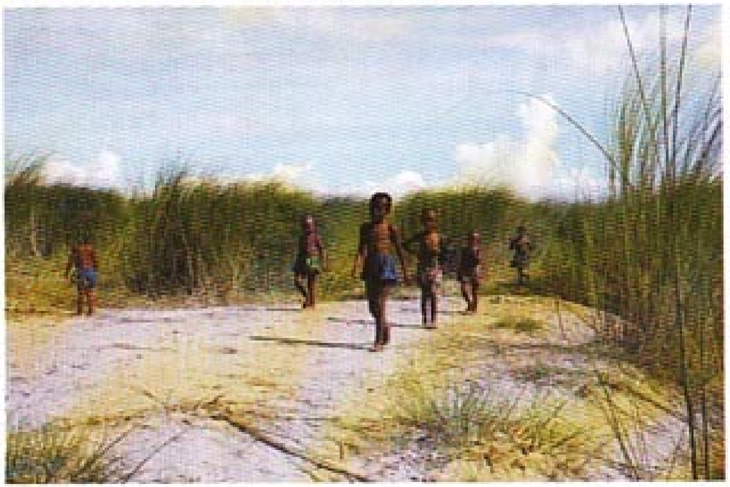

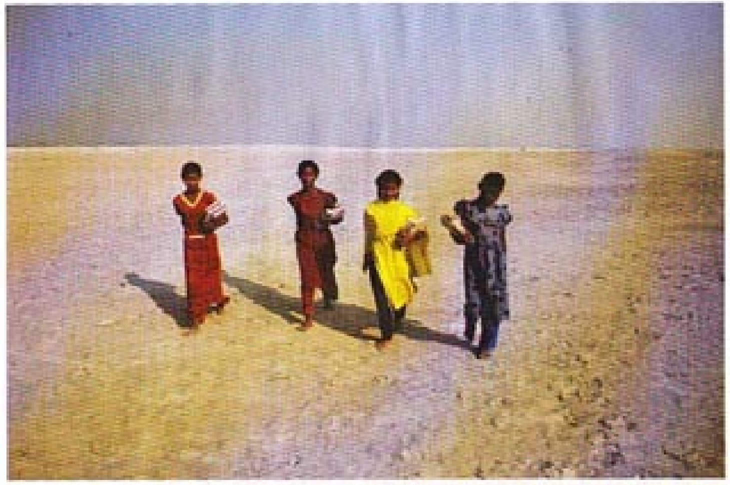

শিক্ষাজীবন

শিক্ষার আগ্রহ যাদের আছে তাদের জন্য চর এলাকা খুবই চ্যালেঞ্জিং। নদী পার হয়ে তপ্ত বালুচর পেরিয়ে ঘর্মক্লান্ত হয়ে তবেই স্কুলে আসা-যাওয়া। ঝরে পড়া অনেককে শিক্ষার মূল ধারায় এনেছে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাকেন্দ্র। আর কুন্দেরপাড়ার গণ উন্নয়ন একাডেমি ওদের স্বপ্নের হাতছানি।

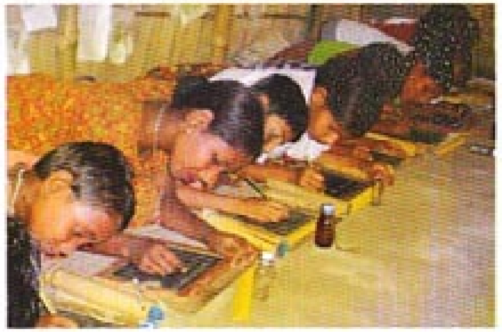

কৃষি উৎপাদন

কুন্দেরপাড়ার প্রধান ফসল ধান, কাউন, চিনা, ভুট্টা হলেও সম্প্রতি সবজি চাষে ব্যাপক সাফল্য অর্জিত হয়েছে। মাঠ ভরা ফসল দেখে কৃষকের চোখ তৃপ্ত হলেও তার পূর্ণ আস্বাদন তারা পায়না। কারণ বেশির ভাগই বর্গাচাষী।

বন্যা মোকাবেলা

বন্যা কুন্দেরপাড়ার নিত্যসঙ্গী। বর্ষায় একসময় এর চারপাশসহ বসতবাড়ী ডুবে যেত। চরের বাসিন্দাদের তখন কিছুই করার থাকতো না। বিভিন্ন পুর্নবাসন ও অবকাঠামোগত উন্নয়নমূলক কাজের মাধ্যমে এখন অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

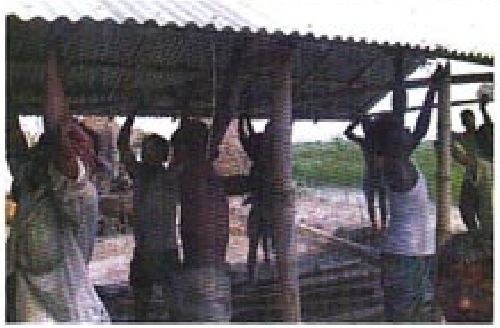

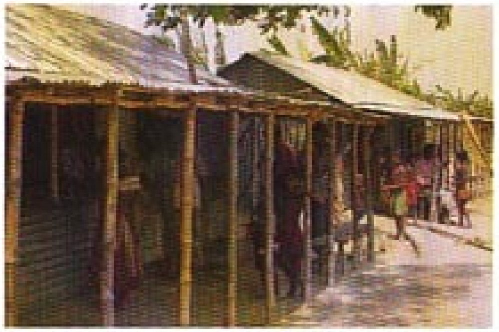

বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র

কুন্দেরপাড়ার কেন্দ্রস্থলে এর মূল অবকাঠামো বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র। সুপরিসর এই আশ্রয়কেন্দ্রেই স্কুল, বিভিন্ন শেড, গরুর আশ্রয় ও ধান শুকানো, গোখাদ্য, জরুরী ত্রাণ ও ঔষধ মজুদ ইত্যাদির ব্যবস্থা রয়েছে। আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা কমিটি এটা পরিচালনা করে।

বসতবাড়ী

কুন্দেরপাড়ার বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে উঁচু বসতবাড়ী। জিইউকে-অক্সফাম এর সহযোগিতায় বসতবাড়ী ও গ্রাম (রাস্তাঘাট) উঁচুকরণে সহায়তা প্রদান করা হয়। এভাবেই গ্রামটি বন্যার ঝুঁকি মুক্ত হয়ে ওঠে।

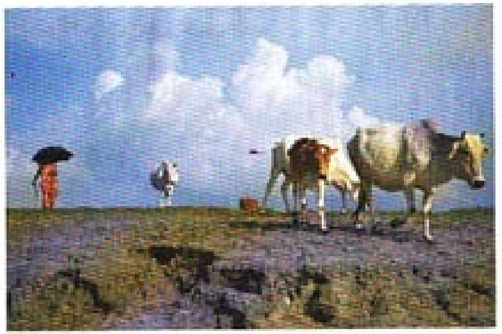

জীবিকায়ন

কৃষির পর গবাদি পশু-পাখি পালন ও মুক্ত জলাশয়ের মাছধরা-দুই ক্ষেত্রেই নির্ভরশীল কুন্দেরপাড়ার অনেকে। এর মধ্যে গরু-ছাগল পালনে অনেকেই তাদের অবস্থার উন্নয়ন করতে পেরেছে

পরিশিষ্ট

তথ্য প্রদানকারীদের তালিকা

এফজিডি-১, তারিখ: ১৭ নভেম্বর, ২০০৯

ক্রঃনং	নাম	পদবী / পরিচিতি
০১	জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান	প্রধান শিক্ষক, কুন্দেরপাড়া গণ উন্নয়ন একাডেমি
০২	জনাব মোঃ নুরুন্নবী সরকার	সদস্য স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি সদস্য, বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র কমিটি প্রাক্তন চেয়ারম্যান, কামারজানি ইউনিয়ন
০৩	জনাব মোঃ কুদরত আলী প্রামানিক	সহঃ শিক্ষক, কুন্দেরপাড়া গণ উন্নয়ন একাডেমি
০৪	শ্যামল কুমার বর্মণ	সহঃ শিক্ষক, কুন্দেরপাড়া গণ উন্নয়ন একাডেমি
০৫	মোসাঃ শিরিন আক্তার শিউলী	এরিয়া ম্যানেজার, কামারজানি এরিয়া জিইউকে
০৬	জনাব মোঃ শাখমল হোসেন সামু	ভাইস প্রেসিডেন্ট, কুন্দেরপাড়া ফ্লাড শেল্টার কমিটি সদস্য, স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি, সাবেক ইউপি, সদস্য -কামারজানি ইউনিয়ন
০৭	জনাব মোঃ আব্দুল মজিদ আকন্দ	সদস্য- স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি
০৮	মোসাঃ শাহিনা আক্তার	সভানেত্রী, মুক্তারমালা মহিলা সমিতি, কুন্দেরপাড়া

এফজিডি-২, তারিখ: ১৭ নভেম্বর, ২০০৯

ক্রঃনং	নাম	সমিতি/দলের নাম	পদবী / পরিচিতি
০১	মোর্শেদা আক্তার	বাঁচার সন্ধান	সভানেত্রী
০২	জহুরা বেগম	জোৎস্না রাত	ক্যাশিয়ার
০৩	সোনাভান বেগম	ফুটন্ত ফুল	ক্যাশিয়ার
০৪	গুজরতি বেগম	স্নিগ্ধা	সদস্য
০৫	মোর্শেদা আক্তার	সপ্তডিঙ্গা	ক্যাশিয়ার
০৬	মমতা বানু	স্নিগ্ধা	ক্যাশিয়ার
০৭	তইমন বিবি	সপ্তডিঙ্গা	সভানেত্রী
০৮	সুরতবানু খাতুন	ভোরের আলো	সভানেত্রী

এফজিডি-৩, ১৮ নভেম্বর, ২০০৯

ক্রঃনং	নাম	সমিতি/দলের নাম	পদবী / পরিচিতি
০১	রাজিয়া বেগম	প্রজাপতি মহিলা সমিতি	সদস্য
০২	শাহিনা বেগম	মুক্তারমালা মহিলা সমিতি	সভানেত্রী
০৩	আরজু আরা	তেপান্তর মহিলা সমিতি	ক্যাশিয়ার

০৪	শাহানাজ বেগম	বাঁচার সন্ধান মহিলা সমিতি	সদস্য
০৫	জহুরা বেগম	সূর্যোদয় মহিলা সমিতি	সভানেত্রী
০৬	হাছিনা খাতুন	বাঁচার পথ মহিলা সমিতি	ক্যাশিয়ার
০৭	জরিফুল বেগম	তেপান্তর মহিলা সমিতি	সদস্য
০৮	চানমালা বেগম	বাচার সন্ধান মহিলা সমিতি	ক্যাশিয়ার

এফজিডি-৪, ১৮ নভেম্বর, ২০০৯

ক্র:নং	ছাত্র/ছাত্রীর নাম	পদবী / পরিচিতি
০১	রূপালী আক্তার	৮ম শ্রেণী, কুন্দেরপাড়া গণ উন্নয়ন একাডেমি
০২	লাভলী বেগম	৮ম শ্রেণী, কুন্দেরপাড়া গণ উন্নয়ন একাডেমি
০৩	লাকী বেগম	৮ম শ্রেণী, কুন্দেরপাড়া গণ উন্নয়ন একাডেমি
০৪	রীনা আক্তার	এস এস সি পরীক্ষার্থী, কুন্দের পাড়া গণ উন্নয়ন একাডেমি
০৫	মাহমুদা আক্তার	৮ম শ্রেণী, কুন্দেরপাড়া গণ উন্নয়ন একাডেমি
০৬	মোঃআসাদুল ইসলাম	১০ম শ্রেণী, কুন্দেরপাড়া গণ উন্নয়ন একাডেমি
০৭	মোঃআনোয়ারহোসেন	৮ম শ্রেণী, কুন্দেরপাড়া গণ উন্নয়ন একাডেমি
০৮	মোঃ ওমর ফারুক	১০ম শ্রেণী, কুন্দের পাড়া গণ উন্নয়ন একাডেমি
০৯	মোঃ শাহীন আলম	৮ম শ্রেণী, কুন্দেরপাড়া গণ উন্নয়ন একাডেমি

সাক্ষাৎকার প্রদানকারী (তারিখ- নভেম্বর ও ডিসেম্বর, ২০০৯)

০১। নুরুন্নবী সরকার, সাবেক চেয়ারম্যান
০২। শাহীনা আক্তার, সভাপতি, মুক্তারমালা সমিতি
০৩। জনাব আসাদুজ্জামান, প্রধান শিক্ষক
০৪। পিঞ্জিরা বেগম, অধিবাসী, কুন্দেরপাড়া
০৫। লাভলী বেগম, অধিবাসী, কুন্দেরপাড়া
০৬। আলেমা বেগম, অধিবাসী, কুন্দেরপাড়া
০৭। মিয়াজান মণ্ডল, ইউপি সদস্য, কামারজানী
০৮। মোঃ আব্দুল কাদের, সাবেক ইউপি সদস্য, কামারজানী ইউপি
০৯। আসমা বেগম, অধিবাসী, কুন্দেরপাড়া
১০। সুরতবানু, সভানেত্রী, ভোরের বেলা মহিলা সমিতি
১১। এছাড়া গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের নির্বাহী প্রধান, বিভিন্ন সময়ে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে দায়িত্বপালনকারী কর্মী এবং ডকুমেন্টেশন ও মনিটরিং সেল-এর কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎকার, সভা ও সেসন থেকে তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই হয়েছে।

ব্যবহৃত শব্দগুচ্ছ

কায়েম এলাকা - যে এলাকা এখন আর নদীভাঙনের সম্ভাবনা নেই।
ঝিনাই ও কোনাই - দুটি পৃথক নদীর নাম।
পলোওয়ালা - ফাল্গুন-চৈত্র মাসে বাঁশের তৈরী পলো দিয়ে মাছ-শিকারীর দল
বেদে - নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী, এরা সাধারণত নৌকায় বাস করে।
দরবারী-উঠোন - লৌকিক সংস্কৃতি হিসেবে পালা আয়োজনের জন্য আঙিনা
বাহরবন্দ পরগণা - গাইবান্ধা জেলা ১৮৩০ সালের পূর্বে এই পরগনার অধীনে ছিল
বরেন্দ্র ও ভাওয়াল - ভূ-প্রকৃতি অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রধান দুই অঞ্চল
প্লায়োস্টোসিন - আনুমানিক পঁচিশ লক্ষ বছর আগে গঠিত চত্বরভূমি
জোতদার - ভূমিকেন্দ্রিক সামন্ত শ্রেণী
লাঠিয়াল - সামন্ত শ্রেণীর শোষণ ও নির্যাতনের জন্য গঠিত বাহিনী
কোষ্ঠী - জন্ম ও বংশতালিকা নির্ণয়ের পদ্ধতি। হিন্দু সমাজে প্রচলিত।
বালাশিঘাট - গাইবান্ধার ট্রেন সার্ভিসের স্টিমারঘাট
উপানুষ্ঠানিক - সুযোগবঞ্চিত শিশুদের জন্য প্রণীত প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা
চড়ুয়া - চরের অধিবাসী
ফড়িয়া - একশ্রেণীর পাইকার ব্যবসায়ী
মঙ্গা - মৌসুমী আয় ও কর্মসংস্থানের মন্দার সময়।
চাপড়ি - আটার তৈরী গ্রামীন খাবার।
খড়ি - শুকনো তৃণ, গুল্ম ও কাঠ যা জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
ঢেঁকি - ধান ভাঙ্গানো সহ গেরস্থালি কাজে ব্যবহৃত লিভারবিশেষ
নেপিয়ার ঘাস - দ্রুত ফলনশীল গোখাদ্য
প্যারা, চীনা, কাউন - গ্রামিনি গোত্রের শস্যবিশেষ, চরাঞ্চলের চালের বিকল্প খাবার।
তুক-তাক, ঝাড়-ফুক - গ্রামীণ অপ-চিকিৎসা
আছর ছাড়ানো - জ্বিন বা ভুতের প্রভাব থেকে মুক্ত করার নামে গ্রামীণ অপচিকিৎসা
ভাসমানএ্যাম্বুলেন্স - কুন্দেরপাড়ায় প্রাথমিক চিকিৎসাসুবিধা সম্পন্ন নৌযান
অনুঘটক - উন্নয়ন ও পরিবর্তন কাজে ভূমিকা রাখে এমন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান
স্যালু মেশিন - সেচকাজে ব্যবহারের জন্য উদ্ভাবিত ইঞ্জিন –যা নৌকা, ধানভাঙ্গানোসহ অনুমোদিত বা অনুমোদিতভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে
এসআরআই পদ্ধতি - ধানচাষের জন্য কৃষি পদ্ধতি
প্রক্সি টিচার - নিয়মিত শিক্ষকের বিকল্প হিসেবে দায়িত্বপালনকারী শিক্ষক
শিকস্তি ও পয়োস্তি - নদীর চরের ভূমির মালিকানা নির্ধারণের আইন
চাতাল - ধান থেকে চাল প্রক্রিয়াকরণ কারখানা

মানচিত্র *(গুগল আর্থ থেকে ধারণকৃত)*

কুন্দেরপাড়ার অবস্থান। চরের দক্ষিণ ও পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্র নদী। মাঝে সারি সারি বাড়িঘর।

গ্রামের কেন্দ্রে নির্মিত বর্গাকৃতির মাঠটিই কুন্দেরপাড়া বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র ও মাধ্যমিক স্কুল।